পুনরুক্ত গল্পমালা
২

মাইকেল মধুসূদন দত্ত

সম্পাদক
অধ্যাপক শ্রীবিজনবিহারী ভট্টাচার্য, এম. এ.

আশুতোষ লাইব্রেরি
৫, কলেজ স্কোয়ার, কলিকাতা

সম্পাদকের নিবেদন

বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস হাজার বছরের কিন্তু সেটা হইল কাগজে কলমে। আসল ইতিহাসের সূচনা পঞ্চদশ শতকে। সেই হইতে অষ্টাদশ শতকের শেষ দিক পর্যন্ত, প্রায় চার-শ বছর ধরিয়া, আমাদের সাহিত্য মন্দিরা মৃদঙ্গ এবং চামর সহযোগে বেশ পরিপুষ্ট হইয়া উঠে। তাহার পরই নবযুগের সূত্রপাত, ইতিহাসকারগণ যাহার নাম দিলেন আধুনিক যুগ। এ যুগে শুধু যে সাহিত্যের রূপ ও রং বদলাইল তাহা নয় উহার প্রকার এবং পরিধিও বহুগুণ বাড়িয়া গেল। সেই আধুনিক যুগও আজ পুরাতন হইতে চলিয়াছে, তাই বর্তমান কালের সাহিত্যের শ্রেণী নির্দেশ করিতে গেলে 'অত্যাধুনিক' শব্দের প্রয়োগ করিতে হয়।

বাঙ্গালা দেশের পাঠকসাধারণের পরিচয় এই অত্যাধুনিক সাহিত্যের সঙ্গেই। রবীন্দ্র-সাহিত্যকেও এই দলে ফেলিতেছি, তাহার কারণ তিনি অত্যাধুনিক কাল পর্যন্ত আমাদের মধ্যে বিদ্যমান ছিলেন। কিন্তু প্রাক্-রবীন্দ্র সাহিত্যের সহিত আজিকার বাঙ্গালী পাঠকের যোগ নাই বলিলেই হয়। এমন কি বঙ্কিমের পাঠকসংখ্যাও আশানুরূপ নয়।

পুরাতনকালের সাহিত্যের সহিত বর্তমানকালের পাঠক-পাঠিকার যৎসামান্য পরিচয় সাধন করাইবার উদ্দেশ্যে এই

নূতন গল্পমালার প্রবর্তন করা হইল। ঐতিহাসিকরা যাহাই বলুন, আমরা পুরাতন কাল বলিতে পঞ্চদশ হইতে উনবিংশ শতক পর্যন্ত এই পাঁচ-শ বছর ধরিয়া লইতেছি।

আলোচ্য গ্রন্থমালার নাম পু ন রু ক্ত গ ল্প মা লা। এই নাম হইতেই বুঝা যাইবে যে, পুরাতন সাহিত্যের সংক্ষেপিত আখ্যানভাগই এই গ্রন্থমালার প্রধান অবলম্বন, যেমন দেখি ল্যাম্ব-এর 'টেল্স্ ফ্রম্ শেক্স্পীয়র'-এ।

মৎসম্পাদিত সংক্ষেপিত বঙ্কিম-গ্রন্থমালার দুই তিন খণ্ড প্রকাশিত হইতে না হইতেই অনেকে গ্রন্থসংক্ষেপণের প্রয়োজন উপলব্ধি করিয়াছিলেন। ফলে অতি অল্প সময়ের মধ্যেই অনেক পুস্তকের সংক্ষিপ্তরূপ বাহির হইয়াছে। এক বঙ্কিম-গ্রন্থাবলীরই একাধিক সংক্ষিপ্ত সংস্করণ দেখিতে পাওয়া যাইতেছে। যে পথে একাকী যাত্রা করিয়াছিলাম সে পথে সহযাত্রীর সমাগম আমার পক্ষে উৎসাহের কারণ সন্দেহ নাই। আশা করি পু ন রু ক্ত গ ল্প মা লা -র অপরিচিত পথেও উৎসাহ পাইতে বিলম্ব হইবে না।

আশুতোষ কলেজ, কলিকাতা

শ্রীবিজনবিহারী ভট্টাচার্য

কৃষ্ণকুমারী

প্রথম পরিচ্ছেদ

১

জয়পুরের রাজা জগৎসিংহ। জয়পুরের রাজবংশের যথেষ্ট সুনাম। কিন্তু সে সুনাম রক্ষা করিবার দিকে জগৎসিংহের কিছুমাত্র আগ্রহ নাই। রাজকার্যে তাঁহার বিশেষ মনোযোগ দেখা যায় না, মন্ত্রীর উপর সমস্ত ভার দিয়াই তিনি নিশ্চিন্ত। বৃদ্ধ মন্ত্রী আজন্ম রাজবংশের সেবা করিয়া আসিতেছেন, তিনি যেমন বুদ্ধিমান, তেমনি বিচক্ষণ, তেমনি বিশ্বাসী। রাজার কর্তব্যে অবহেলা দেখিয়া তিনি মনে মনে দুঃখিত হন এবং উপায়ান্তর না দেখিয়া নিজেই যথাসাধ্য সমস্ত কার্য চালাইয়া লন। মাঝে মাঝে বিশেষ প্রয়োজনে জগৎসিংহের নিকট এক-আধ বার যান। তাহাতেই রাজা বিরক্ত হইয়া উঠেন, মন্ত্রীকে তাড়া দেন। আমোদ-প্রমোদ লইয়াই সর্বদা ব্যস্ত, রাজকার্য দেখিবার অবসর তাঁহার কোথায়? আর অবসর যদি বা থাকে, দেখিবার ইচ্ছা মোটেই থাকে না। তাই মন্ত্রীকে তিনি যথাসাধ্য এড়াইয়া চলেন।

ধনদাস কিন্তু রাজার খুব প্রিয়পাত্র। সে জাতিতে ক্ষত্রিয়। সর্বদাই সে রাজার কাছে কাছে থাকে, রাজার আমোদ-প্রমোদের সেই প্রধান সঙ্গী। ধনদাস যেমন লোভী,

তেমনি ধূর্ত। নানা সময়ে নানা উপলক্ষ্যে রাজাকে সন্তুষ্ট করিয়া কিছু হস্তগত করাই তাহার উদ্দেশ্য। আর সে উদ্দেশ্য সিদ্ধির সুযোগ তাহার প্রায়ই মিলিয়া যাইত। মিলিবে নাই বা কেন? ধনদাসের তো বিবেক বলিয়া কোনো বালাই ছিল না! নিজের লাভের জন্য কোনও কাজকেই সে হীন মনে করিত না। স্বার্থের জন্য সে নিজে তো কুপথে গিয়াছেই, রাজাকেও কুপথে চালিত করিতে সে দ্বিধাবোধ করিত না। জগৎসিংহও দুর্বলচরিত্র, ধনদাসের কথামতই চলিতেন। কাণ্ডাকাণ্ডজ্ঞান তাঁহার ছিল না, তিনি ভাবিতেন ধনদাস তাঁহার প্রকৃত বন্ধু তাই সর্বদাই তাহাকে সঙ্গে লইয়া ফিরিতেন। ধনদাস এক মুহূর্ত কাছে না থাকিলে তাঁহার ভাল লাগিত না। অন্যদিকে বৃদ্ধ মন্ত্রী শুভাকাঙ্ক্ষী হইয়াও তাঁহার কাছে ঘেঁষিতে পারিতেন না। রাজা তাঁহাকে ভাবিতেন একটা আপদ। বিদায় হইলেই বাঁচেন। ইহাকেই বলে দুর্মতি।

একদিন বিশেষ প্রয়োজনে মন্ত্রী একটি পত্র লইয়া রাজার নিকট আসিলেন। রাজা জগৎসিংহ তখন আলস্য-ভরেই কাল কাটাইতেছিলেন, হাতে কোনও কাজই ছিল না। কিন্তু পত্রহস্তে মন্ত্রীকে দেখিয়াই তাঁহার চিত্ত অপ্রসন্ন হইল। তিনি মন্ত্রীকে নিজের ইচ্ছানুসারেই কাজ করিবার আদেশ দিয়া নিজে রাজকার্য হইতে মুক্তি চাহিলেন। মন্ত্রী মহাশয় কহিলেন,—প্রভু এত অল্পে

ক্ষুব্ধ হইলে চলিবে কেন? অনন্তদেবই তো পৃথিবীর ভার সর্বদা সহ্য করেন।

অনন্তদেবের সহিত নিজের তুলনায় রাজা হাসিয়া উঠিলেন। কোথায় দেবতা আর কোথায় মানুষ! মন্ত্রীকে তিনি একটু পরিহাস করিতেও ছাড়িলেন না। বৃদ্ধ মন্ত্রী কি যেন বলিতে যাইতেছিলেন কিন্তু হঠাৎ এক ব্যক্তি ঘরে প্রবেশ করিতেই তিনি নিরস্ত হইলেন। যে প্রবেশ করিল, সে আর কেহই নয়, রাজবয়স্য ধনদাস। একে মনসা, তাহাতে আবার ধুনার গন্ধ। এক অকর্মণ্য বসিয়া আছেন, আর এক কর্মনাশা আসিয়া জুটিল। কোনও কাজ হইবার আর সম্ভাবনা নাই। অগত্যা মন্ত্রিবর নিরাশ হইয়া চলিয়া গেলেন।

রাজা জগৎসিংহও হাঁপ ছাড়িয়া বাঁচিলেন। ধনদাসকে দেখিয়াই তাঁহার মন আনন্দে পূর্ণ হইল। আসন হইতে লাফাইয়া উঠিয়া তাহাকে সাদর সম্ভাষণ জানাইলেন, সাগ্রহে তাহার কুশল জিজ্ঞাসা করিলেন। চতুর ধনদাস মৃদু হাস্য করিতে করিতে তাঁহার নিকটে আসিয়া বসিল। কহিল,—আজ্ঞে এ অধীন মহারাজের চিরদাস, প্রভুর শ্রীচরণ প্রসাদে সেবকের সর্বাঙ্গীণ মঙ্গল। মহারাজ উত্তর শুনিয়া তুষ্ট হইলেন। কিন্তু পরমুহূর্তেই একটা সংবাদ শুনিয়া তাঁহার সকল উৎসাহ নিভিয়া গেল, কপালে চিন্তার রেখা ফুটিয়া উঠিল।

এখানে একটা কথা বলা দরকার। ধনদাসকে যে রাজা এত ভাল বাসিতেন তাহার আর একটু বিশেষ কারণও আছে। এই ধনদাসই ঘুরিয়া ঘুরিয়া নানাস্থান হইতে রাজার জন্য রানীর খোঁজ লইয়া আসিত। রাজা জগৎসিংহের অনেক রানী; কিন্তু তবু ধনদাসের খোঁজার বিরাম নাই। যেখানেই কোনও সুন্দরী মেয়ে দেখিতে পায় তাহাকেই রাজার রানী করিবার জন্য লইয়া আসে।

আজ ধনদাস আসিয়া কিন্তু একটি দুঃসংবাদ দিল। দেশে নাকি আর এমন সুন্দরী অবশিষ্ট নাই, যাহাকে রাজ-অন্তঃপুরে গ্রহণ করা চলে। শুনিয়া রাজা বিষণ্ণ হইলেন। ভাবিলেন, উপায় কি তবে! উপায় কিন্তু ধূর্ত ধনদাস পূর্ব হইতেই ঠিক করিয়া রাখিয়াছিল; তবে সেটা যে কেবল রাজার মনস্তুষ্টির জন্যই নহে, তাহা সহজেই অনুমান করা যায়।

ধনদাস কহিল,—মহারাজ, উপায়ের কথা পরে নিবেদন করিতেছি, আগে এই চিত্রপটখানি দেখুন। এই বলিয়া সে রাজার হাতে একটি চিত্রপট দিল এবং দূরে দাঁড়াইয়া রাজার মুখের ভাব লক্ষ্য করিতে লাগিল। চিত্র দেখিয়া রাজা তো স্তব্ধ: কাহার এ চিত্র? এমন অপূর্ব প্রতিমূর্তি কাহার? কে এই সুন্দর মুখচ্ছবির অধিকারিণী? বাস্তবিক বিস্মিত হইবারই কথা। এ অলোকসামান্য রূপ পৃথিবীতে দুর্লভ। রাজা অমন রূপ কখনও দেখেন নাই। আশ্চর্য

হইয়া তিনি ছবির দিকে তাকাইয়া রহিলেন। ভাবিলেন ইঁহাকে রানী করিতে পারিলে বেশ হয়। ধনদাসকে তাঁহার ইচ্ছা জানাইতেই সে বলিল যে এই সুন্দরী কন্যাটি এদেশের নয়, তাঁহাকে পাওয়াও সহজ নয়। রাজা ব্যস্ত হইয়া এই কন্যার পরিচয় জানিতে চাহিলেন। ধনদাস কহিল,—ইনি উদয়পুরের রাজদুহিতা, ইঁহার নাম কৃষ্ণকুমারী।

রাজার মুখ আনন্দে উদ্ভাসিত হইয়া উঠিল। ভাবিলেন উদয়পুরের রাজদুহিতা ভিন্ন এমন অপূর্ব রূপলাবণ্য আর কাহার হইবে? যে মহাবংশে শত শত মহাবীর জন্মগ্রহণ করিয়াছেন, যে বংশের যশঃসৌরভে এই ভারতভূমি সমুদ্ভাসিত সেই বংশে যদি ইঁহার জন্ম না হয় তবে আর কোথায় হইবে? ছবিটি রাজার বড়ই ভাল লাগিল। ছবিটি তিনি নিজের কাছে রাখিবার ইচ্ছা প্রকাশ করিলেন। কথা শুনিয়া ধনদাস মনে মনে সন্তুষ্ট হইলেও মুখে একটা উদ্বেগের ভাব দেখাইল। বলিল, বড়ই দুঃখের বিষয় যে ছবিটি মহারাজকে দিবার উপায় নাই। রাজা কারণ জিজ্ঞাসা করিতেই সে বুঝাইয়া বলিল যে ছবিটি আসলে তাহার নয়, তাহার হইলে সে এই মুহূর্তেই মহারাজকে উহা উপহার দিয়া কৃতার্থ হইত। উদয়পুর হইতে একজন বন্ধু আসিয়াছে; সে-ই এ ছবিটি বিক্রয় করিবার জন্য দিয়াছে।

শুনিয়া রাজার মুখ আনন্দে উজ্জ্বল হইল। মূল্য দিলেই তো চিত্রটি পাওয়া যাইবে! তিনি মূল্য জানিতে চাহিলেন।

ধূর্ত ধনদাস কিছুক্ষণ ভাবিয়া ইতস্ততঃ করিতে করিতে বলিল যে মূল্য কিছু বেশী। কিন্তু জগৎসিংহের নিকট চিত্রখানি অমূল্য, যে কোনও মূল্যেই তিনি উহা লইতে রাজী। রাজার মনের ভাব দেখিয়া ধনদাস সাহস পাইল, একেবারে বিশ সহস্র মুদ্রা হাঁকিয়া বসিল।

সে ভাবিয়াছিল রাজা হয়তো কিছু দরদাম করিবেন, কিছু কমাইবার জন্য অনুরোধ করিবেন; কিন্তু তাহার কোনও লক্ষণই দেখা গেল না। তিনি অম্লানবদনে মূল্য দিতে স্বীকৃত হইলেন। শুধু তাই নয়, তৎক্ষণাৎ কোষাধ্যক্ষকে পত্র দিবার জন্য ব্যস্ত হইয়া পড়িলেন। ধনদাসের মন তো আনন্দে নাচিতে লাগিল। তাড়াতাড়ি সে দোয়াত ও কলমদান লইয়া আসিল। রাজা কোষাধ্যক্ষের নামে পত্র লিখিলেন। আনন্দে গদ্‌গদ হইয়া ধনদাস কহিল,—মহারাজ স্বয়ং দাতাকর্ণ। কিন্তু দাতাকর্ণ মহারাজও মনে মনে ভাবিতে লাগিলেন যে তাঁহার খুব লাভ হইয়াছে, অমূল্য চিত্রপটখানি মাত্র বিশ সহস্র মুদ্রায় পাইয়া গিয়াছেন।

কিন্তু রাজা যাহাই ভাবুন না কেন ধনদাস বিলক্ষণ লাভ করিল। বিনা খরচেই রাজাকে ঠকাইয়া বিশ সহস্র মুদ্রা পাইয়া গেল। ছবিটি সে উদয়পুরের একজন বণিকের নিকট হইতে কৌশলে প্রায় বিনামূল্যেই হস্তগত করিয়াছিল। বিশ হাজার মুদ্রা পুরাপুরিই তাহার লাভ। চতুর ধনদাসের দুর্বুদ্ধির তো অভাব ছিল না। পরকে ঠকানই তাহার

পেশা। আজ রাজাকে এমন চমৎকার ঠকাইতে পারিয়া সে নিজের বুদ্ধিকে ধন্য ধন্য করিতে লাগিল।

কিন্তু তাহার চক্রান্ত এইখানেই শেষ হইল না, এই তো সবে সূত্রপাত। সে যে বিরাট লাভের ষড়যন্ত্র ফাঁদিয়াছিল, তাহার আরম্ভ হইল মাত্র। রাজা জগৎসিংহ চিত্রে কৃষ্ণকুমারীর রূপ দেখিয়া মুগ্ধ হইয়াছেন লক্ষ্য করিয়া ধনদাস পুলকিত হইয়া উঠিল। সে রাজাকে জানাইল যে তাহার কথা শুনিলে এবং সেইমত কাজ করিলে রাজা অনায়াসেই স্ত্রীরত্নটি লাভ করিতে পারেন। শুনিয়া জগৎসিংহ আনন্দে অধীর হইয়া উঠিলেন, প্রিয়বন্ধু ধনদাসকে আজ প্রিয়তর মনে হইতে লাগিল। ভাবিলেন, হায় তেমন অদৃষ্ট কি হইবে যে উদয়পুরের রাজকুমারী কৃষ্ণা তাঁহার রানী হইবেন! ধনদাস বুঝাইয়া বলিতে লাগিল যে মহারাজের পূর্বপুরুষেরা উদয়পুরের রাজবংশে অনেকবার বিবাহ করিয়াছেন; সুতরাং জগৎসিংহও যদি উদয়পুরের রাজকুমারীর পাণিগ্রহণ করিবার ইচ্ছা প্রকাশ করেন, তবে সে আশা অবশ্যই পূর্ণ হইবে। তাহা ছাড়া মহারাজ তো কুলে, মানে, রূপে, গুণে সকল দিক দিয়াই কুমারী কৃষ্ণার উপযুক্ত পাত্র। মহারাজকে জামাতারূপে লাভ করা উদয়পুরের সৌভাগ্যের কথা!

তাঁহার পূর্বপুরুষেরা যে এই বংশে বিবাহ করিয়াছেন একথা রাজা জানিতেন; কিন্তু তাঁহার মনে আশঙ্কা ছিল যে মহারাজ ভীমসিংহ নিতান্ত অভিমানী, যদি তিনি এ বিষয়ে

অসম্মত হন, তবে তো তাঁহার মান থাকে না। এ আশঙ্কার কথা রাজবয়স্য ধনদাসের মনেও যে জাগে নাই, তাহা নয়। সে কিন্তু তাহাতে বিচলিত হইবার পাত্র নয়। রাজাকে সে স্পষ্ট জানাইয়া দিল যে তিনি ইচ্ছা প্রকাশ করিলেই ভীমসিংহ নিশ্চয় রাজী হইবেন। কারণ মহারাজ সূর্যবংশচূড়ামণি, রাজা নিজের গুণ নিজে না জানিলেও অন্যে কি তাঁহাকে অবহেলা করিতে পারে ?

ধনদাসের কথায় কিছুটা আশ্বস্ত ও আশান্বিত হইলেও রাজার ইচ্ছা তিনি মন্ত্রীমহাশয়ের সঙ্গে এবিষয়ে একটু পরামর্শ করিয়া দেখেন। বৃদ্ধ মন্ত্রীকে রাজা এড়াইয়া চলিতে চেষ্টা করিতেন বটে ; কিন্তু তাঁহার মন্ত্রণার উপর তাঁহার খুব বিশ্বাস ছিল। আর এমন একটা কাজে হস্তক্ষেপ করার আগে মন্ত্রীর সহিত পরামর্শ করা যে বিশেষ প্রয়োজন, এবিষয়ে তাঁহার মনে এতটুকু সন্দেহ ছিল না।

অগত্যা ধনদাস মন্ত্রীকে ডাকিয়া রাজার ইচ্ছা সমস্তই তাঁহাকে খুলিয়া বলিল। মন্ত্রী সব শুনিলেন কিন্তু প্রথমে কোনও উত্তর দিলেন না। কিছুক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া বলিলেন, বিবাহ হওয়া এমন কিছু কঠিন ব্যাপার নয়, তবে কিনা একটি বাধা আছে। বাধার কথা শুনিয়াই রাজার মুখ বিষণ্ণ হইয়া পড়িল। তিনি জানিতে চাহিলেন বাধাটা কি। মন্ত্রী তখন সমস্ত ব্যাপার খুলিয়া বলিলেন।

মরুদেশের অধিপতি বীরসিংহের সঙ্গে এই রাজকুমারীর বিবাহের কথা উত্থাপিত হইয়াছিল। পরে বীরসিংহ অকালে মারা যাওয়ায় বিবাহ সম্পন্ন হইতে পারে নাই। এখন শুনা যাইতেছে যে ঐ দেশের বর্তমান রাজা মানসিংহ কুমারী কৃষ্ণাকে বিবাহ করিতে ইচ্ছুক।

রাজা জগৎসিংহ একথা শুনিয়া বিরক্ত হইয়া উঠিলেন। কহিলেন,—কি? বামন হইয়া চাঁদে হাত? মানসিংহের স্পর্ধা দেখিয়া তিনি মনে মনে জ্বলিয়া উঠিলেন। মন্ত্রীকে বলিলেন,—দেখ মন্ত্রী, এই দণ্ডেই উদয়পুরে লোক পাঠাও। আমি এই রাজকন্যাকে বিবাহ করিব। মানসিংহ যদি ইহাতে বাধা দেয় তবে আমি তাহাকে সমুচিত শাস্তি দিব।

মন্ত্রী দেখিলেন মহাবিপদ। এখন কি ঘরোয়া বিবাদের সময়? শত্রুদল চতুর্দিকে দিন দিন প্রবল হইয়া উঠিতেছে। মহারারাষ্ট্রীয় সৈন্য তো দেশ আক্রমণ করিবার জন্য প্রায় প্রস্তুত হইয়াই আছে। রাজাকে অবস্থাটা বুঝাইবার অনেক চেষ্টা করিয়াও বৃদ্ধ সফলকাম হইতে পারিলেন না। তাঁহার সকল চেষ্টা ব্যর্থ হইল। রাজা কিছুই বুঝিলেন না। তিনি ভাবিলেন শত্রুদলকে ভয় করিবার এমন কি কারণ আছে! এক দিল্লীর সম্রাট! তিনি তো এখন বিষহীন ফণী। আর মহারাষ্ট্রের রাজা! সেটা তো নিতান্তই লোভী, যৎকিঞ্চিৎ অর্থ পাইলেই সন্তুষ্ট। আর রাজা মানসিংহের সাধ্য কি যে, জগৎসিংহের সঙ্গে

বিবাদ করেন ? বৃদ্ধ মন্ত্রীর ভয় দেখিয়া রাজা বিচলিত হইলেন না, তিনি দূত প্রেরণ করিবার জন্য মন্ত্রীকে আদেশ দিলেন।

ধনদাস ব্যস্ত হইয়া উঠিল। দূতের জন্য আর ভাবিতে হইবে কেন ? সেই তো এ বিষয়ে বিশেষ নিপুণ। তাহাকে পাঠাইলেই তো হয়। রাজা তাহার কথা শুনিয়া ভাবিলেন, ঠিকই তো। ধনদাস একজন সদ্বংশজাত ক্ষত্রিয়, তাহার যাওয়াতে দোষ কি ? ধনদাসের যাওয়াই ঠিক হইল।

মন্ত্রী তাহাকে লইয়া পরামর্শ করিবার জন্য প্রস্থান করিলেন। রাজা ভাবিতে লাগিলেন, আহা এমন ভাগ্য কি তাঁহার হইবে, মহারাজ ভীমসিংহ তাঁহার পরমাসুন্দরী কন্যা কৃষ্ণকুমারীকে প্রদান করিবেন! মাঝে মাঝে তাঁহার মন কেমন একটা নৈরাশ্যে ভরিয়া যাইতে লাগিল। আবার কখনও ভাবিলেন, হইবে নাই বা কেন ? তিনি কম কিসে ? আর ধনদাস যেমন সুচতুর লোক, সে নিশ্চয় কাজটা উদ্ধার করিতে পারিবে।

বসিয়া বসিয়া রাজা ভাবিতেছেন, এমন সময় হঠাৎ ধনদাস ফিরিয়া আসিল। তাহাকে ফিরিয়া আসিতে দেখিয়া রাজা বিস্মিত হইয়া তাহার মুখের দিকে চাহিলেন। ফিরিয়া আসার কারণ জিজ্ঞাসা করিতেই সে বলিল মন্ত্রীর সঙ্গে তাহার একটা বিষয়ে মতের মিল হইতেছে না, তাই সে ফিরিয়া আসিয়াছে। ব্যস্ত হইয়া রাজা কহিলেন, কি

বিষয়ে? ধনদাস বলিল, উদয়পুরে যাইতে হইলে তাহার বিবেচনায় কতকগুলি সৈন্য সঙ্গে লওয়া প্রয়োজন; কিন্তু মন্ত্রী সৈন্য দিতে নারাজ। তিনি বলেন তাহাতে অনেক অর্থব্যয় হইবে।

জগৎসিংহ হাসিয়া উঠিলেন, ভাবিলেন বৃদ্ধ হইলে মানুষের এমনি মতিভ্রম হইয়া থাকে। মন্ত্রী বৃদ্ধ হইয়াছেন, তাঁহার কি আর কাণ্ডজ্ঞান আছে? সৈন্যসামন্ত না লইয়া একা একা ধনদাস উদয়পুরে যাইবে এ কথা ভাবিতেও লজ্জায় তিনি মরিয়া গেলেন। একে তো ভীমসিংহ অত্যন্ত শক্তিশালী তাহা ছাড়া জগৎসিংহেরও তো একটা মর্যাদা আছে! রাজা তৎক্ষণাৎ মন্ত্রীকে ধনদাসের সঙ্গে একশত অশ্ব, পাঁচটা হাতী আর এক সহস্র পদাতিক প্রেরণ করিবার জন্য আদেশ দিলেন।

আদেশ শুনিয়া ধনদাসের অন্তর একেবারে নাচিয়া উঠিল। মন্ত্রীর সঙ্গে মতদ্বৈধ হওয়াতে প্রথমে সে একটু ঘাবড়াইয়া গিয়াছিল; কিন্তু এখন দেখিল যে মন্ত্রীর উপর তাহারই জয়। আনন্দে গদ্‌গদ হইয়া সে রাজাকে খুব তোশামোদ করিতে লাগিল। রাজা কিন্তু কার্যোদ্ধারের কথাই ভাবিতেছিলেন। তিনি বলিলেন, দেখ ধনদাস, নল রাজা রাজহংসকে দূত করিয়া দময়ন্তীর নিকটে পাঠাইয়াছিলেন, আমিও তোমাকে দূত করিয়া পাঠাইতেছি। কর্ম যেন নিষ্ফল না হয়।

ধনদাস মজা পাইল। রাজার কথা শুনিয়াই কহিল,—আজ্ঞে প্রাণ দিয়াও আপনার কাজ করিব, তাহাতে সন্দেহ নাই; কিন্তু একটি নিবেদন আছে। নল রাজা যে হংসকে দূত করিয়া পাঠাইয়াছিলেন, তাহার সোনার পাখা ছিল, এ দাসের কি আছে?

রাজা বুঝিলেন। হাসিতে হাসিতে তিনি তাঁহার হস্ত হইতে একটি অঙ্গুরী খুলিয়া ধনদাসকে দিলেন। অঙ্গুরী পাইয়া ধনদাস খুব খুশী। বাস্তবিক অঙ্গুরীটি মহামূল্য। উহার উজ্জ্বল মণিটির দিকে চাহিতে ধনদাসের চোখ দুটিও উজ্জ্বল হইয়া উঠিল। রাজার গুণগান করিতে করিতে সে বিদায় হইল।

২

বিলাসবতী জগৎসিংহের প্রণয়িনী। সে ছিল এক দরিদ্রের কন্যা। ধনদাস তাহাকে কৌশলে গৃহ হইতে বাহির করিয়া আনিয়া রাজার হস্তে অর্পণ করে। তখন হইতে তাহার ভাগ্য ফিরিয়া যায়। রাজার ভালবাসা পাইয়া সে ধন্য হয় এবং সেও রাজাকে প্রাণ দিয়া ভালবাসিতে থাকে। কিন্তু এই কয় দিন বিলাসবতীর মন নানা দুশ্চিন্তায় ভরিয়া উঠিয়াছে। রাজা তাহার কাছে আসা একেবারে বন্ধ করিয়া দিয়াছেন। কেন যে এইরূপ হইতেছে বিলাসবতী তাহা কিছুই বুঝিতে পারিল না। না পারিয়া চিন্তায় সে একেবারে মুহ্যমান হইয়া পড়িল। ভাবিল, রাজা কি তবে অসুস্থ? অথবা তাঁহার কাজের খুব চাপ পড়িয়াছে? না হইলে একটিবারও তাহার সহিত দেখা করিতে আসিতেছেন না কেন?

মদনিকা বিলাসবতীর সঙ্গিনী। সে যেমন বুদ্ধিমতী তেমনি চতুরা। বিলাসবতীকে সে প্রাণ দিয়া ভালবাসিত। বিলাসবতীও তাহাকে বিশেষ স্নেহ করিত। মদনিকার উপর তাহার অগাধ বিশ্বাস। বিলাসবতীর শুষ্ক মুখ দেখিয়া মদনিকা দুঃখিত হইয়া কারণ জিজ্ঞাসা করিল। উত্তর শুনিয়া সে আরও বিমর্ষ হইয়া পড়িল।

রাজা যে কেন আসিতেছেন না, তাহা সে ভালভাবেই

জানিত। সখীকে সে কথা বলিলে সে খুবই দুঃখিত হইবে সত্য, কিন্তু না জানাইয়াও তো কোনও লাভ নাই? বরং জানাইলে কিছু উপকার হইতে পারে। এই ভাবিয়া মদনিকা ব্যাপারটা খুলিয়া বলিল। পূর্ব অপরাধ ভুলিয়াও বিলাসবতী যাহার বহু উপকার করিয়াছে, সেই ধনদাস আজ বিশ্বাসঘাতকতা করিয়া বিলাসবতীরই বিরুদ্ধে ষড়-যন্ত্রের জাল পাতিয়াছে। সে উদয়পুরের রাজা ভীমসিংহের একমাত্র কন্যা পরমরূপবতী কৃষ্ণার সহিত রাজার বিবাহ দিবার চেষ্টায় মাতিয়াছে।

এ সংবাদ বিলাসবতীর বুকে শেলের মত বাজিল। উদয়পুরের রাজকন্যা কুমারী কৃষ্ণা যে অপূর্ব সুন্দরী একথা বিলাসবতী জানিত। অমন সুন্দরী যদি ভীমসিংহের মহিষী হইয়া আসেন তাহা হইলে রাজা যে আর তাহার কাছে আসিবেন না, একেবারে ভুলিয়াই যাইবেন, এ আশঙ্কা তাহার মনে বারবার জাগিতে লাগিল। দুঃখে অভিমানে বিলাসবতীর চোখে জল আসিল।

এদিকে ধনদাস মহা খুশী। মন্ত্রী তাহার সঙ্গে সৈন্য দিতে নারাজ ছিল; কিন্তু রাজাকে বলিয়া সে সব ব্যবস্থাই করিয়াছে। বৃদ্ধ মন্ত্রীও হার মানিয়াছে তাহার কাছে। গর্বে, আনন্দে ধনদাসের বুক ফুলিয়া উঠিল। সে ঠিক করিল সৈন্যদলের ব্যয়ের জন্য যে টাকাটা পাওয়া যাইবে, তাহা হাত করিতে হইবে। আর পথের মধ্যে যেখানে যাহা

পাইবে তাহাও ছাড়া হইবে না। এত লোক যাহার সঙ্গে তাহার আবার ভয় কিসের? চাটুবাক্যে রাজাকে প্রসন্ন রাখাই ছিল ধনদাসের পেশা, কিন্তু আজ সৈন্য লইয়া বিদেশ যাত্রা করিতে গিয়া তাহার কেমন নূতন নূতন ঠেকিতে লাগিল। এত সৈন্যের অধ্যক্ষ ভাবিয়া নিজেকে মস্ত বড় লোক বলিয়া মনে হইল।

ধনদাস ভাবিল যাইবার আগে একবার বিলাসবতীর সঙ্গে দেখা করিয়া যাইতে হইবে। তাহার মনে একটি দুরভিসন্ধিও ছিল। সে জানিত কৃষ্ণকুমারী রানী হইলে রাজা আর বিলাসবতীর দিকে ফিরিয়াও চাহিবেন না, নিশ্চিত তাহাকে দূর করিয়া দিবেন। তখন সে বিলাসবতীকে লইয়া গিয়া নিজে বিবাহ করিবে।

ধনদাস বিলাসবতীর গৃহের দিকে রওনা হইল। হতভাগ্য জানিত না যে তাহার কার্যকলাপ ইতিমধ্যেই বিলাসবতী ধরিয়া ফেলিয়াছে।

ধূর্তকে আসিতে দেখিয়াই বিলাসবতীর অন্তরাত্মা জ্বলিয়া উঠিল। কিন্তু সে মুখে বিরক্তির ভাব প্রকাশ করিল না। ধীরে ধীরে জিজ্ঞাসা করিল,—তুমি নাকি একখানা চিত্রপট মহারাজের নিকট বিশ হাজার টাকায় বিক্রয় করিয়াছ?

প্রশ্ন শুনিয়াই তো ধনদাসের মাথায় আকাশ ভাঙিয়া পড়িল। সে খানিক ফ্যাল ফ্যাল করিয়া তাকাইয়া থাকিয়া

অবশেষে কহিল,—এ সব মিথ্যা কথা শোন কেন? দুষ্ট লোকে তো চিরকালই বাজে কথা রটাইয়া বেড়ায়। কিন্তু তাই বলিয়া তাহাদের সকল কথাই কি বিশ্বাস করিতে হইবে? কিন্তু বিলাসবতী এ বক্তৃতায় টলিল না। কিছুক্ষণ পরে ধনদাসের অঙ্গুলীর দিকে তাকাইয়া সে বলিল,—এই অঙ্গুরীটি কোথায় পাইলে?

ধনদাস এইবার নিতান্তই কাবু হইল। মিথ্যা দিয়া আর কতক্ষণ বিলাসবতীকে ভুলাইবে? তথাপি সে চেষ্টা করিতে ছাড়িল না। বলিল, রাজা তাহাকে অঙ্গুরীটি রাখিতে দিয়াছেন। রাজা যে কেমন রাখিতে দিয়াছেন তাহা বিলাসবতী ভালই জানিত। সে এইবার আসল কথাটি তুলিল। কহিল,—তুমি নাকি উদয়পুরের রাজকন্যার সঙ্গে মহারাজের বিবাহ দিবার চেষ্টা করিতেছ?

ধনদাস এইবার আর কোনও উত্তর দিতে পারিল না, হেঁটমুখে বসিয়া রহিল। মনে মনে ভাবিতে লাগিল, কি মুশকিল, এ স্ত্রীলোকটা আবার এসব কথা কেমন করিয়া শুনিল?

ধনদাসকে চুপ করিয়া থাকিতে দেখিয়া বিলাসবতী সুযোগ পাইল। ঘটক মহাশয়কে বেশ কয়েকটি কথা শুনাইয়া দিতে ছাড়িল না। সে যে তাহার ধূর্তপনা পূর্বেই জানিয়াছে তাহা বুঝিতে ধনদাসের আর বাকী রহিল না। বিলাসবতী আরও জানাইল যে সে যদি তাহার প্রতি

ধনদাসের ব্যবহারের কথা পূর্বে রাজাকে বলিয়া দিত, তবে আর তাহার রক্ষা থাকিত না। রাজা তৎক্ষণাৎ তাহাকে রাজ্য হইতে দূর করিয়া দিতেন, চাই কি প্রাণ পর্যন্ত লইতে পারিতেন।

বিলাসবতী তাহাকে শাসাইতেছে দেখিয়া ধনদাসেরও পিত্ত জ্বলিয়া উঠিল। ভাবিল, কালের ধর্ম! নহিলে তাহাকে সে অপমান করে কি বলিয়া? কলিকালে যাহার উপকার করা যায়, সে-ই উপকার ভুলিয়া অপকার করিবার চেষ্টা করে। বিলাসবতীর কম উপকার সে করিয়াছে! তাহারই দয়ায় তো বিলাসবতীর অবস্থা ফিরিল, আজ রাজ-ইন্দ্রাণী হইয়া বসিয়া অপমান করিবে বইকি।

বিলাসবতী বলিল, রাজ-আশ্রিতা হইয়াই বা তাহার সুখ কোথায়? আজ কৃষ্ণকুমারীর সঙ্গে বিবাহ হইলে কালই রাজা তাহার সহিত সকল সম্পর্ক ছিন্ন করিবেন। বলিতে বলিতে বিলাসবতীর চোখ দুইটি জলে ভরিয়া উঠিল, সে আর কথা বলিতে পারিল না।

ধনদাস মহাবিপদে পড়িল। স্ত্রীলোকের চোখে জল দেখিয়া তাহার মন যে গলিয়া গেল, এমন নয়; তথাপি সে সান্ত্বনা দিয়া বলিল, এ বিবাহ সে কিছুতেই হইতে দিবে না। বিশেষ করিয়া এই অভিপ্রায়েই ঘটকালির ভার সে নিজে লইয়াছে।

ধনদাসের কথা বিলাসবতীর কানেই গেল না। গেলেও উহাকে আর বিশ্বাস করিবে কে? শঠের চরিত্র তো সব

জানা গিয়াছে। দীর্ঘনিশ্বাস ছাড়িয়া বিলাসবতী বসিয়া বসিয়া ভাবিতে লাগিল। তাহার চোখ দুইটি বার বার জলে ভরিয়া আসিল।

সঙ্গিনী মদনিকা আসিয়া এই অবস্থায় তাহাকে দেখিয়া দুঃখে কাতর হইয়া পড়িল। খানিক চুপ করিয়া থাকিয়া কহিল, তুমি কিছু ভাবিও না। ধনদাস ভাবে তাহার মত সুচতুর আর কেহ নাই, কিন্তু এইবার দেখা যাইবে তাহার ঘটে কত বুদ্ধি!

বিলাসবতী সহচরীর কথা কিছুই বুঝিতে পারিল না। কিন্তু মদনিকার মুখ দেখিলেই বুঝিতে পারিত যে সে একটা কিছু করিবার জন্য স্থিরপ্রতিজ্ঞ হইয়াছে। মদনিকার মুখে বিশ্বাসের আভাস, চোখে আশার আলো।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

১

উদয়পুরের মহারাজা ভীমসিংহ যেমন সৎস্বভাব, তেমনি কর্তব্যপরায়ণ। রাজকার্যে তিনি সর্বদাই এত ব্যস্ত যে প্রায়ই যথাকালে আহার নিদ্রার পর্যন্ত অবকাশ ঘটে না। অন্তঃপুরে প্রবেশ করিবার সময় তাঁহার প্রায়ই হয় না। রানী অহল্যা দেবী ও প্রাণপ্রিয়া কন্যা কৃষ্ণার মুখ দেখিবার সুযোগ পর্যন্ত তাঁহার অদৃষ্টে কদাচিৎ জুটে।—রাজকার্যের এমনই চাপ! প্রজাপালনের কঠিন দায়িত্ব তো আছেই তাহার উপর আবার আর এক মহাবিপদ—ঐ মারাঠার দল! এই দুর্ধর্ষ মারাঠাজাতিকে লইয়া ব্যতিব্যস্ত হইয়া উঠিতে হয়। মারাঠাদস্যুরা যেমন লোভী তেমনি বিশ্বাস-ঘাতক। তাহারা যে কখন হঠাৎ আসিয়া দেশ আক্রমণ করিবে তাহার কিছুমাত্র নিশ্চয়তা নাই। অর্থ দিয়া তাহাদিগকে বশ করিতে হয়। কিন্তু সে বশ্যতাও সাময়িক। ঘি দিয়া যেমন আগুন নিবান যায় না, অর্থের দ্বারা তেমনি অর্থ-লোভীর লোভ দূর করা যায় না। দুদিন যাইতে না যাইতেই আবার অর্থের লোভে ফিরিয়া আসে, দেশের প্রজার উপর অত্যাচার করে, আবার অর্থ লইয়া বিদায় হয়। এই মহারাষ্ট্রীয় আক্রমণের আশঙ্কায় মহারাজা ভীমসিংহ সর্বদা

অশান্তিতে কাটাইতেছেন। তিনি ধীরচিত্ত শান্তিপ্রিয় লোক; কিন্তু তাঁহার কপালেই নানা অশান্তি।

রানী অহল্যাদেবী তো স্বামীর অবস্থা দেখিয়া কাঁদিয়াই আকুল। মহারাজের শরীরের দিকে তাকাইলে তিনি চোখের জল সংবরণ করিতে পারেন না। শরীর কি ছিল কি হইয়াছে! সোনার মত বর্ণ কালি হইয়া গিয়াছে, বলিষ্ঠ দেহ দিনে দিনে ক্ষীণ ও কৃশ হইয়া যাইতেছে, মুখের প্রফুল্লতা গিয়াছে, সেখানে চিন্তা ও ক্লেশের রেখা ফুটিয়া উঠিয়াছে। সময়ে আহার নাই, নিদ্রা নাই; এমন করিলে কি শরীর ভাল থাকে! রাজার জন্য রানী ভাবিয়া আকুল।

মাঝে মাঝে রাজার উপর তাঁহার খুব রাগ হয়। ভাবেন এমন রাজকার্য লইয়া লাভ কি? রাজসুখের তো সীমা নাই। কেবল চিন্তা, কেবল দুঃখ, কেবল অশান্তি। তাহার উপর আবার নানাপ্রকার ভয়ও আছে। সে সব কথা ভাবিতে রানীর গা শিহরিয়া উঠে। কিন্তু রাজা যে একটি বারও অন্তঃপুরে আসিবার সময় পান না, সেই জন্যই রানীর অভিমান হয় বেশী। তিনি কতদিন কৃষ্ণাকে দেখেন নাই। তাহা ছাড়া কন্যা এইবার বড় হইয়াছে, তাহার বয়স পঞ্চদশে পৌঁছিয়াছে; তাহার বিবাহের সময় উপস্থিত। অথচ রাজা এ বিষয়ে মোটেই ভাবিতেছেন না। তাঁহার চিন্তা কেবল রাজ্য ও প্রজা লইয়া। অহল্যাদেবী দুঃখে অভিমানে কাঁদিতে থাকেন।

তপস্বিনী রাজগৃহের একজন শুভাকাঙ্ক্ষিণী। তিনি মাঝে মাঝে রাজ-অন্তঃপুরে আসিয়া রানীর সহিত সাক্ষাৎ করেন। সংসার বিষয়ে উদাসীন হইলেও রানীর দুঃখ দেখিয়া তাঁহার দয়া হইত। তিনি নানা উপদেশ দিয়া তাঁহাকে শান্ত করিতে চেষ্টা করিতেন। বলিতেন, যাঁহারা যত মহৎ তাঁহাদের দুঃখ তত বেশী। রামায়ণের রামচন্দ্র অথবা মহাভারতের মহারাজ যুধিষ্ঠিরের জীবনের প্রতি লক্ষ্য করিলেই তাহা বেশ বোঝা যায়। আর রাজকার্য তো সুখ-ভোগের জন্য নয়, রাজার কর্তব্য বড় কঠোর। সমস্ত প্রজার দুঃখকে নিজের বলিয়া গ্রহণ করিতে পারিলেই তবে রাজ-সিংহাসনে বসিবার যোগ্য হওয়া যায়। মহারাজ ভীমসিংহ রাজা হইয়া অশেষ কষ্ট সহ্য করিতেছেন সত্য, কিন্তু তাঁহার এ কষ্ট স্বীকার বৃথা হইবে না। ভগবান একদিন প্রসন্ন হইয়া তাঁহার কল্যাণ করিবেন। ভগবতী তপস্বিনীর কথায় রানী অনেকটা আশ্বস্ত হন।

বহুদিন পরে রাজা ভীমসিংহ একদিন অন্তঃপুরে আসিবার সময় পাইলেন। তপস্বিনীও সেদিন রাজগৃহে আসিয়াছিলেন। রাজা আসিয়া ভগবতী তপস্বিনীকে প্রণাম করিয়া কুশল জিজ্ঞাসা করিলেন। তপস্বিনী বলিলেন,—সকলই কুশল। আশীর্বাদ করিয়া রাজার কুশল জিজ্ঞাসা করিতেই ভীমসিংহ জানাইলেন ভগবান একলিঙ্গের প্রসাদে ও তপস্বিনীর আশীর্বাদে দিন একরকম কাটিয়া যাইতেছে। রাজ্যের লক্ষ্মী

এখনও পর্যন্ত বর্তমান আছেন, কিন্তু আঁর কতদিন থাকিবেন তাহা বলা কঠিন। তপস্বিনী রাজাকে মধুর বাক্যে অনেক আশ্বাস দিলেন। ধৈর্য ধারণ করিবার জন্য অনেক উপদেশ দিলেন।

বহুদিন পরে রাজাকে অন্তঃপুরে দেখিয়া রানীর চোখে জল আসিল, রাজা মিষ্ট কথায় তাঁহাকে শান্ত করিলেন। এমন সময় রাজভৃত্য এক পত্র লইয়া উপস্থিত হইল। পত্রটি মন্ত্রীমহাশয় পাঠাইয়াছেন। রানী ভাবিলেন আবার কি বিপদ উপস্থিত! তাঁহার মুখে উদ্বেগের ছায়া ফুটিয়া উঠিল। কিন্তু চিঠি পড়িয়া রাজা স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলিলেন। কহিলেন,—এতদিনের পর বোধ হয় এ রাজ্য কিছুকালের জন্য নিরাপদ হইল।

কথা শুনিয়া তপস্বিনী ও রানী উভয়েই আনন্দিত হইলেন। কিন্তু কিরূপে রাজ্য নিরাপদ হইল তাহা জানিবার জন্য তাঁহাদের মন উৎসুক হইয়া উঠিল। রাজা জানাইলেন, মহারাষ্ট্রের অধিপতির সঙ্গে একপ্রকার সন্ধি হইবার উপক্রম হইয়াছে। তিনি এই পত্রে অঙ্গীকার করিয়াছেন যে, ত্রিশ লক্ষ মুদ্রা পাইলে স্বদেশে ফিরিয়া যাইবেন। শুনিয়া রানী নিশ্চিন্ত হইলেন।

রাজা প্রথমটা স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলিয়াছিলেন বটে কিন্তু যখন একটু গভীরভাবে ভাবিয়া দেখিলেন, তখন বুঝিলেন বিশেষ আনন্দিত হইবার কোনও কারণ নাই। মহারাষ্ট্র-

পতির পত্র পাইয়া তাঁহার মনে নূতন করিয়া এক অশান্তির উদয় হইল। সামান্য দস্যুর কাছে তাঁহাকে নতি স্বীকার করিতে হইল ভাবিয়া তিনি কিছুতেই শান্তি পাইলেন না। আর নতি স্বীকারেরই বা মূল্য কি? মারাঠাদের চরিত্র তো জানা আছে। আজ সন্ধি করিয়াছে সত্য; কিন্তু এ সন্ধির স্থায়িত্ব কয় দিন? অর্থ হস্তগত হইলেই আবার যে সন্ধি ভঙ্গ করিবে না তাহার নিশ্চয়তা কোথায়? বিড়াল একবার যেখানে দুধের গন্ধ পায়, সে স্থান কি আর ছাড়িতে চায়? মহারাষ্ট্র-অধিপতি যে অর্থের লোভে আবার আসিবেন তাহাতে ভীমসিংহের তিলমাত্র সন্দেহ ছিল না।

রাজা যাহাই ভাবুন না কেন জঞ্জাল একরকম মিটিয়া গেল ভাবিয়া অহল্যা দেবীর চিন্তা দূর হইল এবং সুযোগ বুঝিয়া তিনি কৃষ্ণার বিবাহের প্রসঙ্গ তুলিলেন। ঠিক সেই সময়েই কোথা হইতে একটি মিষ্ট বংশিধ্বনি ভাসিয়া আসিল। বাঁশী বাজাইতেছিল কৃষ্ণা। বাগানে সে তাহার সঙ্গিনীদিগকে লইয়া বেড়াইতে বেড়াইতে বাঁশী বাজাইতেছিল।

কৃষ্ণার কথা ভাবিতে গেলেই একটা আশঙ্কা অহল্যা দেবীর মনকে পীড়িত করিয়া তুলিত। তিনি ভাবিতেন, হায়, দিল্লীর অধিপতি কিংবা অন্য কোনও পাষণ্ড কুমারী কৃষ্ণার অপূর্ব রূপলাবণ্যের কথা শুনিতে পাইলে কি আর রক্ষা থাকিবে? একটা দুর্ঘটনা ঘটা মোটেই অসম্ভব নয়। এই বংশেই তো এইরূপ কাণ্ড ঘটিয়া গিয়াছে।

পদ্মিনী দেবীর কথা রানীর বারবার মনে হইত। সেই আশঙ্কার কথা আজ রাজাকেও জানাইলেন। শুনিয়া ভীমসিংহও একটু চিন্তিত হইলেন।

তপস্বিনী কহিলেন,—মহারাজ, কলিকালে স্বয়ম্বর প্রথাটা একেবারেই উঠিয়া গিয়াছে, নতুবা আপনার এই কৃষ্ণার পাণিগ্রহণের লোভে এতদিন কত দেশ হইতে কত রাজা আসিতেন!

রাজা দীর্ঘশ্বাস ছাড়িয়া ভাবিতে লাগিলেন,—হায়, সে ভারত কি আর আছে, না দেশের সে শ্রী আছে! ভারত-বর্ষ কি ছিল, কি হইয়াছে! এখন দুষ্ট যবনদল দেশে আসিয়া স্বর্গভূমিকে শ্রীভ্রষ্ট করিয়াছে।

বাস্তবিক বিবাহের সেই মহোৎসব আজকাল লোপ পাইতে চলিয়াছে। এখন স্বয়ম্বর সমারোহ দূরে থাক, সাধারণভাবে কন্যার বিবাহ দেওয়াই এক বিপত্তির কারণ হইয়া উঠিয়াছে। কারণ কোথাও কোনও রাজার সুন্দরী কন্যা আছে জানিতে পারিলেই যবনেরা আসিয়া কাড়িয়া লইয়া যাইতে চায়। ভয়ে স্বয়ম্বর-সভা করা দূরে থাক, বিবাহে সামান্য একটু ঘটা করিতেও রাজারা ভয় পান।

কৃষ্ণকুমারী এতক্ষণ সহচরীদের সহিত বেড়াইতেছিল, এইবার রানী ও তপস্বিনী যেখানে বসিয়া গল্প করিতেছিলেন, সেইখানে আসিয়া উপস্থিত হইল। বহুদিন পরে তপস্বিনী কৃষ্ণাকে দেখিলেন। কৃষ্ণা এখন বড় হইয়াছে। তাহার

সুন্দর রূপ সুন্দরতর হইয়া উঠিয়াছে। তপস্বিনী দেখিলেন, লোকে যে বলে এমন রূপলাবণ্য জগতে দুর্লভ সেকথা মিথ্যা নয়। কুমারী কৃষ্ণার দিকে তাকাইলে আর চোখ ফিরাইতে ইচ্ছা করে না। রাজা ভীমসিংহ ও রানী অহল্যার মহা সৌভাগ্য যে তাঁহারা এমন কন্যারত্ন লাভ করিয়াছেন।

কৃষ্ণা তপস্বিনীকে অনেক দিন দেখে নাই তাই তাঁহাকে প্রথমে চিনিতে পারে নাই। পরিচয় পাইলে প্রণাম করিয়া পায়ের ধুলা লইল। তপস্বিনী তাহাকে অনেক আশীর্বাদ করিলেন।

রাজাও অনেকদিন পরে ভাল করিয়া কন্যার মুখ দেখিলেন। তাঁহার মনও আনন্দে পূর্ণ হইল। কৃষ্ণাকে দেখিয়া কত কথা তাঁহার মনে হইতে লাগিল। কাছে ডাকিয়া কন্যাকে অনেক আদর করিলেন। অনেক দিন পরে পিতার আদর পাইয়া কৃষ্ণার মন খুশিতে পূর্ণ হইল। সে তাহার সাধের বাগানে পিতাকে একটিবার যাইবার জন্য অনুরোধ করিল। সেখানে কত ফুল ফুটিয়াছে, কত লতা উঠিয়াছে। ভাবিল, সে সমস্ত দেখিয়া পিতা খুব খুশী হইবেন। কৃষ্ণার হাতে একটি সুন্দর গোলাপ ফুল ছিল। সেটি সে আনিয়াছিল মাতার জন্য। ফুলটি লইয়া অহল্যা দেবী দেখিতে লাগিলেন। আহা কি সুন্দর ফুল, কেমন রং, কেমন গঠন! রাজার মনে কিন্তু ঐ ফুলটি দেখিয়াই আর এক চিন্তা জাগিয়া

উঠিল। তিনি ভাবিলেন, গোলাপ পূর্বে এদেশে ছিল না—যে সর্প এ মণিটি আনিয়াছে, তাহার গরলে ভারতভূমি প্রতিদিন দগ্ধ হইতেছে। যবনেরাই তো ঐ ফুল এদেশে আনিয়াছিল। রাজা দীর্ঘশ্বাস ফেলিলেন।

এমন সময় হঠাৎ দূরে দুন্দুভিধ্বনি শুনা গেল। সকলেই চকিত হইয়া উঠিলেন। রাজা ডাক দিলেন, রামপ্রসাদ! ভৃত্য বাহিরে অপেক্ষা করিতেছিল, ডাক শুনিয়া ছুটিয়া আসিল এবং রাজার আদেশে দুন্দুভিধ্বনি কিসের তাহা জানিবার জন্য দ্রুত বাহির হইয়া গেল।

ভীমসিংহের ললাটে চিন্তার রেখা ফুটিয়া উঠিল। কিসের এই শব্দ? তবে কি মহারাষ্ট্রপতি সন্ধি অবহেলা করিয়া আবার যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইল! এত অর্থ দিয়াও নিষ্কৃতি নাই! ক্ষোভে, দুঃখে, রাগে রাজার মন বিষাক্ত হইয়া উঠিল।

ভৃত্য ফিরিয়া আসিতেই তিনি ব্যস্ত হইয়া দুন্দুভিধ্বনির কারণ জিজ্ঞাসা করিলেন। ভৃত্য যাহা উত্তর দিল, তাহাতে সকলেরই মন হইতে দুশ্চিন্তা পলকের মধ্যে ছুটিয়া গেল এবং সকলেই স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলিলেন।

আসলে কোনও বিপদই ঘটে নাই। মহারাষ্ট্রপতিও সন্ধি অবহেলা করেন নাই। ভৃত্য জানাইল যে সকলই মঙ্গল। জয়পুরের রাজা জগৎসিংহ রায় রাজসম্মুখে কোনও বিশেষ কাজের জন্য দূত পাঠাইয়াছেন। তাহারই জন্য ঐ দুন্দুভিধ্বনি। শুনিয়া রাজা আশ্বস্ত হইলেন। জয়পুরের

অধিপতি তাঁহার পরমাত্মীয়। কিন্তু তিনি কোনও বিপদে পড়িয়া দূত পাঠান নাই তো?—রাজার সন্দেহ হইল। তপস্বিনী, রানী ও কন্যার কাছে বিদায় লইয়া তিনি সভার দিকে চলিলেন।

রানী দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিলেন; ভাবিলেন, হায় তাঁহার এমন কি সৌভাগ্য যে রাজার সহিত বেশীক্ষণ কথা কহিবেন! অনেকদিন পরে যদি বা রাজা একবার সময় করিয়া আসিয়াছিলেন, একদণ্ড বসিতে না বসিতেই আবার তাঁহাকে যাইতে হইল। রাজা বিদায় লইলে রাজমহিষী ও তপস্বিনী কৃষ্ণার উদ্যান দেখিবার ইচ্ছা প্রকাশ করিলেন। শুনিয়া কৃষ্ণার আনন্দ আর ধরে না। বাগানে গিয়া সে লতাপাতা, ফুল ফল দেখাইয়া ফিরিতে লাগিল। কিন্তু পিতা একটিবারও এসমস্ত দেখিতে আসিলেন না, এই দুঃখ তাহার মন হইতে গেল না।

২

এদিকে মদনিকা এক কাণ্ড করিয়াছে। সে পুরুষের বেশ ধরিয়া উদয়পুরে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছে। এমনভাবে সাজিয়াছে যে কাহারও সাধ্য নাই তাহাকে চিনিতে পারে। বিলাসবতীর খুবই ইচ্ছা এ বিবাহটা না হয়। তাহার ইচ্ছা পূর্ণ করিবার জন্য এবং বিশেষ করিয়া ধূর্ত ধনদাসকে উপযুক্ত শাস্তি দিবার উদ্দেশ্যেই মদনিকা উদয়পুরে আসিয়া পদার্পণ করিয়াছে। সে ধনদাসকে দেখাইয়া দিবে যে তাহার অপেক্ষাও চতুর লোক পৃথিবীতে আছে।

মদনিকার বুদ্ধি সত্যই অদ্ভুত। আসিয়াই সে রাজা মানসিংহকে কৃষ্ণকুমারীর নাম করিয়া এক চিঠি লিখিয়াছে। চিঠিখানা সে এমন কৌশলে রচনা করিয়াছে যে পাইবামাত্র মানসিংহ কৃষ্ণার জন্য একেবারে অস্থির হইয়া পড়িবেন। রুক্মিণী শিশুপালের হাত হইতে রক্ষা পাইবার জন্য যেমন কৃষ্ণকে মিনতি করিয়া চিঠি লিখিয়াছিলেন, ঠিক তেমনিভাবে কৃষ্ণা যেন জগৎসিংহের হাত হইতে উদ্ধারের জন্য মানসিংহকে লিখিতেছেন। কিন্তু শুধু এইটুকু কাজ করিয়াই মদনিকা ক্ষান্ত হয় নাই। সে উদয়পুরের রাজমন্ত্রীকে রাজা জগৎসিংহ সম্বন্ধে অনেক কথা বলিয়াছে। তাঁহার বহু নিন্দা করিয়াছে। রাজা জগৎসিংহ যে বিলাসবতী নামক একটি রমণীকে খুব ভালবাসেন এবং তাহারই কথামত চলেন একথা জানাইতেও

সে ভুলে নাই। মন্ত্রী তাহার কথা সবই মন দিয়া শুনিয়াছিলেন। রাজা জগৎসিংহ কৃষ্ণাকে বিবাহ করিলে কৃষ্ণা যে মোটেই সুখী হইবে না একথা মন্ত্রীর মনে হইল। ভাবিলেন উদয়পুরের মহারাজ ভীমসিংহের একমাত্র সাধের কন্যা পরম রূপবতী স্বর্ণপ্রতিমা কুমারী কৃষ্ণাকে ঐ রকম একটা রাজার হাতে পড়িতে দেওয়া হইবে না। মন্ত্রীর মন বিগড়াইয়া দিয়া মদনিকার আনন্দের সীমা রহিল না। তাহারই কৌশলে ধনদাসের সকল চেষ্টা ব্যর্থ হইবে, ইহা ভাবিয়া সে মনে মনে খুব খুশী হইল।

ধনদাস মন্ত্রী সত্যদাসের সঙ্গে দেখা করিতেই তিনি বলিলেন যে জগৎসিংহের সহিত কৃষ্ণকুমারীর বিবাহ দেওয়া চলে না। রাজা বিলাসবতী নামক এক রমণীর প্রতি অনুরক্ত। কৃষ্ণা কি তাঁহার কাছে মহিষীর সম্মান ও সমাদর পাইবেন ?

ধনদাস দেখিল মহাবিপদ। মন্ত্রী যে কি করিয়া এসমস্ত খবর পাইলেন, তাহা সে বুঝিতেই পারিল না। ভয়ে ভাবনায় ধনদাসের মুখ শুকাইয়া গেল। কিন্তু তবু সে ছাড়িবার পাত্র নয়। বলিল,—ও সকল কথায় কান দিবেন না মন্ত্রীমশায়! লোকে অমন নানা মিথ্যা গুজব রটায়। কাহারও ভাল কেহ দেখিতে পারে না।

মন্ত্রী কিন্তু তাহার কথায় বিশ্বাস করিতে পারিলেন না। তিনি বলিলেন যে কিছু সত্য না থাকিলে লোকে এত কথা

বলিবে কেন? আর কি করিয়াই বা বলিবে? নিশ্চয় রাজার দোষ আছে।

কথা শুনিয়া ধনদাস মুশকিলে পড়িল। অনেক বুঝাইয়াও যখন মন্ত্রীকে বশে আনা গেল না, তখন সে বলিল, মহারাজ জগৎসিংহ একজন মহাতেজস্বী বীরপুরুষ। তিনি কি আর বিলাসবতীর কথায় চলিতে পারেন? কৃষ্ণকুমারীর যোগ্য পাত্র তিনি। কৃষ্ণাকে পাইবার জন্য তিনি খুব আগ্রহান্বিত। তা মন্ত্রী যদি বলেন তো রাজা বিলাসবতীকে দূর করিয়াও দিতে পারেন। কৃষ্ণার মত রানী পাইলে তিনি কি না করিতে পারেন?

মন্ত্রী কতকটা আশ্বস্ত হইলেন। তিনি চলিলেন রাজার নিকটে। ধনদাস ভাবিতে ভাবিতে ফিরিতেছিল হঠাৎ একজনের দিকে চোখ পড়িতেই থামিয়া গেল।—একটি বালক, বেশ সুশ্রী দেখিতে। চেহারাও যেন পরিচিত মনে হইল। ধনদাস যেন তাহাকে পূর্বে কোথাও দেখিয়াছে অথচ কোথায় দেখিয়াছে, কবে দেখিয়াছে, মনে করিতে পারিল না। বালকটিকে সে নিকটে ডাকিল।

এখন এই বালকটি যে কে তাহা বোধ হয় না বলিলেও বুঝিতে পারা যায়। এ আর কেহ নয়, বিলাসবতীর সখী মদনিকা, বালকের বেশে আসিয়াছে। মন্ত্রীর সঙ্গে যখন ধনদাস কথা কহিতেছিল তখন সে আড়াল হইতে সব শুনিতেছিল; মন্ত্রী চলিয়া যাইতেই বাহির হইয়া পড়িল।

সুন্দর বালকটি কাছে আসিতেই ধনদাস বলিল,—তোমার নাম কি ভাই?

বালকটি বেশ সপ্রতিভভাবেই উত্তর করিল,—আজ্ঞে আমার নাম মদনমোহন।

উত্তর শুনিয়া ধনদাস ভাবিল, বাঃ নামের সঙ্গে চেহারার তো বেশ মিল আছে। বালকটির সহিত কথা বলিয়া ধনদাস জানিতে পারিল যে, সে উদয়পুরের রাজসংসারে থাকিয়াই লেখাপড়া করে। যাহার যেমন মন, তেমনি চিন্তা। ধনদাস ভাবিল, ছেলেটা চালাক আছে, নহিলে রাজসংসারে থাকিতে যাইবে কেন? দেশে কি আর টোল পাঠশালা নাই? অর্থলোভেই যে সে রাজগৃহে থাকে সে বিষয়ে ধনদাসের মনে আর কোনও সন্দেহ রহিল না। যাই হোক বালকটি যখন রাজসংসারেই থাকে, তখন নিশ্চয় কুমারী কৃষ্ণাকে দেখিয়াছে। কৃষ্ণার রূপগুণের কথা কিছু শুনিবার লোভ সে সামলাইতে পারিল না। রাজকুমারী কিরূপ সুন্দরী একথা সে বালককে জিজ্ঞাসা করিল। বালকটি বলিল,—কুমারী কৃষ্ণা সুন্দরী সত্যই, তবে বিলাসবতীর মত অতটা নন।

কথা শুনিয়া ধনদাস আঁৎকাইয়া উঠিল, ছেলেটা বলে কি? হতভাগা ও নাম জানিল কি করিয়া! কহিল,—বিলাসবতী কে হে বাপু? যেন সে কিছুই জানে না। মদনমোহন জানাইল যে সে মন্ত্রী ও ধনদাসের কথোপকথন সব শুনিয়া

ফেলিয়াছে। কাজেই এখন আর ছলনা করিলে কি হইবে?

ধনদাসের মাথায় যেন আকাশ ভাঙিয়া পড়িল। ছি ছি, তাহার সমস্ত কৌশলই তবে বুঝি এই সামান্য বালকটা পণ্ড করিয়া দেয়! বিলাসবতীর কথা একমাত্র মন্ত্রীই জানিতেন তাঁহাকে তো বুঝাইয়া শুঝাইয়া ঠিক করা হইয়াছিল। আবার কোথা হইতে একটা হতভাগা জুটিয়া সব ফাঁস করিতে চলিল। কিন্তু উপায় কি এখন? ধনদাস ভাবিল ইহার মুখ বন্ধ করিতে হইবে, নহিলে সব ব্যর্থ। মিষ্টস্বরে মদনমোহনকে সে অনেক বুঝাইল, এই সব রাজা-রাজড়ার ব্যাপারে থাকা ভাল নয়, বিশেষ মদনমোহন বালকমাত্র, ঐ সমস্ত বড় কথায় কান দেওয়া তাহার একেবারে অনুচিত, উহাতে বিপদও আছে। যাহা হইয়াছে হইয়াছে, এখন তাহার চুপ করিয়া যাওয়াই ভাল। ধনদাস শেষে মদনমোহনকে মিষ্টান্ন খাওয়াইবার লোভও দেখাইল।

মিষ্টান্নের কথা শুনিয়া খুশী হওয়া দূরে থাক, মদনমোহন তো চটিয়াই লাল। সে কি ছোট শিশু যে মিষ্টান্নের লোভে ভুলিবে? ব্যস্ত হইয়া ধনদাস বলিল,—তবে বল ভাই, তুমি কি পাইলে সন্তুষ্ট হও! আর যায় কোথায়?—মদনমোহন একেবারে ধনদাসের হাতের অঙ্গুরীটি চাহিয়া বসিল। যে সে অঙ্গুরী নয়, রাজা বিদায়কালে যে মহামূল্য অঙ্গুরীটি ধনদাসকে দান করিয়াছিলেন, তাহারই উপর মদনমোহনের লোভ।

মদন আশ্বাস দিল ঐটি পাইলে সে আর কাহাকেও কোনও কথা বলিবে না। শুনিয়া ধনদাসের মাথা ঘুরিয়া গেল। কিন্তু মুখের প্রফুল্লতা বজায় রাখিয়া হাসিতে হাসিতে বলিল,—ছি ভাই তুমি কি পাগল হইয়াছ? এটি লইয়া তুমি কি করিবে? এটি কি কাহাকেও দেওয়া যায়?

ধনদাসের কথা শুনিয়া মদন সোজা রাজ-প্রাসাদের দিকে চলিতে আরম্ভ করিল।

হায় হায়, হতভাগা সব ফাঁস করিয়া দিবে! নিরুপায় হইয়া ধনদাস মদনকে ডাকিয়া ফিরাইয়া আনিল। অঙ্গুরীটি দিতে তাহার প্রাণ ফাটিয়া যাইতেছিল; কিন্তু না দিয়াই বা উপায় কি? হতভাগ্য ধনদাস! অনেক কৌশল করিয়া সে মহামূল্য অঙ্গুরীটি পাইয়াছিল, তাহাই আজ দিতে হইল। মদনমোহন খুশী হইয়া চলিয়া গেল।

ধনদাস বোকার মত দাঁড়াইয়া রহিল। ক্ষোভে, দুঃখে, রাগে তাহার চোখ ফাটিয়া জল আসিতে লাগিল। হায়, এমন হইবে তাহা সে স্বপ্নেও ভাবে নাই। কি কুক্ষণেই না ঐ বালকটার সঙ্গে তাহার দেখা হইয়াছিল! উহার দ্বারা যে এত ক্ষতি হইবে তাহা কে জানিত!

৩

কৃষ্ণার বিবাহের জন্য রানীই বিশেষ উৎসাহী ছিলেন। এ বিষয়ে রাজার অমনোযোগ তাঁহার ভাল লাগিতেছিল না। রাজা রাজকার্যে ব্যস্ত থাকিয়া কন্যার বিবাহের কথা একটি-বারও ভাবিতে পারেন নাই দেখিয়া অহল্যাদেবী সত্যই দুঃখ পাইতেন; কিন্তু আজ বিবাহের প্রস্তাব আসিতেই তাঁহার মনের ভাব পরিবর্তিত হইয়া গেল। কন্যার বিবাহ হইবে জানিয়া আজ আর তিনি সুখ পাইতেছেন না। হায়! এত আদরের এত সাধের কৃষ্ণা, যাহাকে তিনি এত কষ্ট করিয়া এত দুঃখ সহ্য করিয়া মানুষ করিয়াছেন, যাহার বিচ্ছেদ এক মুহূর্ত সহ্য করা তাঁহার পক্ষে অসম্ভব, কেমন করিয়া তাহাকে একেবারে বিদায় দিবেন। অহল্যাদেবীর মনের ভাব আজ লক্ষ্য করিলে কে বলিবে যে তিনিই পূর্বে কৃষ্ণার বিবাহের জন্য এত ব্যস্ত হইয়া উঠিয়াছিলেন? সাধের কৃষ্ণা চলিয়া যাইবে ভাবিতেই তাঁহার চোখে জল আসে, অন্তর গভীর দুঃখে ভরিয়া যায়। এই ক-দিন তিনি আহার নিদ্রা প্রায় বন্ধ করিয়াছেন, আর তাঁহার দুই চোখ দিয়া অবিরল জলধারা পড়িতেছে। অহল্যাদেবীর অবস্থা দেখিয়া তপস্বিনী তাঁহাকে সান্ত্বনা দেন, নানা উপদেশ দিয়া নানা দৃষ্টান্ত দেখাইয়া শান্ত করিতে চেষ্টা করেন। বলেন,—সময়ে সবই সহ্য হইয়া যাইবে। অহল্যাদেবীও তো একদিন পিতার গৃহে ছিলেন, কিন্তু আজ

স্বামীর গৃহকেই আপনার গৃহ বলিয়া জানিয়াছেন। ইহাই জগতের নিয়ম। রাজকুমারী কৃষ্ণাকেও তেমনি পতিগৃহে যাইতে হইবে—সেও চিরদিন পিতার আলয়ে থাকিতে পারে না।

তপস্বিনীর সান্ত্বনাবাণী ও উপদেশ শুনিয়া অহল্যাদেবী কিছু শান্ত হন বটে, কিন্তু কন্যার কথা ভাবিলে চোখের জল কিছুতেই সংবরণ করিতে পারেন না।

বিবাহের কথা হইতেছে বটে, কিন্তু কৃষ্ণার দিনগুলি যেমন কাটিতেছিল তেমনি কাটিতে লাগিল। হয়তো সে ও বিষয়ে তেমন মন দেয় নাই অথবা বিবাহের কথা তাহার কানেই যায় নাই। সঙ্গীদের লইয়া বাগানে বেড়াইয়া, গান গাহিয়া সে দিব্য আনন্দে কাল কাটায়।

কিন্তু এই অবস্থা বেশীদিন স্থায়ী হইল না। মদনিকা আসিয়া তাহার মনের এই স্বাভাবিক আনন্দটুকু হরণ করিয়া লইল। নির্মল আকাশে প্রথম মেঘোদয় হইল।

ধনদাসের অঙ্গুরীটি লইবার পর মদনমোহন আবার বেশ পরিবর্তন করিল। পোশাক পরিচ্ছদ খুলিয়া ফেলিয়া আবার আপনার আসল রূপটি ধরিল।—আবার নারী হইল। তারপর সে মানসিংহের দূতী সাজিয়া কৃষ্ণার সহিত দেখা করিতে চলিল।

কৃষ্ণার কাছে উপস্থিত হইয়া মদনিকা এক অদ্ভুত কাহিনী ফাঁদিয়া বসিল। তাহার বুদ্ধির তো অভাব নাই! কহিল,—সে মরুরাজ মানসিংহের দূতী, অনেক কষ্ট সহ্য করিয়া, বহু বাধাবিঘ্ন অতিক্রম করিয়া তবে সে এই উদয়পুরে আসিয়া

উপস্থিত হইয়াছে। পথে কষ্ট হইলেও কুমারী কৃষ্ণার সুন্দর মুখখানি দেখিয়া সকল দুঃখই সে ভুলিয়া যাইতেছে। নিজের প্রশংসা শুনিয়া কৃষ্ণা লজ্জায় মাথা নীচু করিল। মদনিকা বলিতে লাগিল,—মরুরাজ মানসিংহ!—যেমন তাঁহার রূপ তেমনি গুণ। অমন বীর আর ত্রিভুবনে দেখা যায় না। তিনি একদিন স্বপ্নে কৃষ্ণার রূপ দেখেন। তাহার পর লোকের মুখে কৃষ্ণার রূপ ও গুণের কথা শুনিয়া একেবারে পাগল হইয়া যাইবার উপক্রম। তিনি কৃষ্ণাকে বিবাহ করিবার জন্য ব্যাকুল। মহারাজ এখনও বিবাহ করেন নাই। তিনি ঠিক করিয়াছেন কৃষ্ণকুমারীকে পান ভাল, নহিলে জীবনে আর বিবাহই করিবেন না। সেই জন্যই তিনি দূতীকে কৃষ্ণকুমারীর নিকট পাঠাইয়াছেন।

দূতীর কথা শুনিয়া কৃষ্ণা অবাক হইয়া গেল। দূতী কষ্ট করিয়া এখানে আসিয়াছে! পথে কত বিপদ! ভাবিতে তাহার গায়ে কাঁটা দিয়া উঠিল। রাজা মানসিংহের কথা শুনিয়া সে অবাক না হইয়া পারে নাই। মানসিংহ তাহাকে স্বপ্নে দেখিয়া মুগ্ধ হইয়াছেন এবং বিবাহ করিবেন ঠিক করিয়াছেন! কেমন সেই মানসিংহ, কেমন তাঁহাকে দেখিতে! মদনিকার কথা কৃষ্ণা সম্পূর্ণ বিশ্বাসই করিয়াছিল; কিন্তু একটা জিনিস তাহার কেমন অস্বাভাবিক ঠেকিতেছিল। মহারাজ মানসিংহের যদি কৃষ্ণাকে বিবাহ করিবার একান্তই ইচ্ছা তবে তিনি পিতা ভীমসিংহের কাছে দূত না পাঠাইয়া

তাহার নিকট এই দূতীকে পাঠাইলেন কেন? দূতীকে একথা জিজ্ঞাসা করিতেই চতুর মদনিকা চট করিয়া জবাব দিল। বলিল,—মহারাজ মানসিংহ বুদ্ধিমান লোক, তিনি সহসা কোনও কাজে হাত দেন না। কৃষ্ণাকে বিবাহ করিতে চান; কিন্তু কৃষ্ণার ইচ্ছাও তাঁহার জানা দরকার। তাঁহার ইচ্ছা না জানিয়া তিনি কি করিয়া ভীমসিংহের নিকট দূত প্রেরণ করেন! দূতী মত লইয়া গেলে তিনি অবশ্যই ভীমসিংহের নিকট দূত পাঠাইবার ব্যবস্থা করিবেন।

কৃষ্ণার মনে আর কোনও সন্দেহ রহিল না। মদনিকাও খুশী হইল। সরোবরের তীরে সখীরা কৃষ্ণার জন্য অপেক্ষা করিতেছিল। সে আর বসিতে পারিল না, দূতীকে আবার আসিবার জন্য অনুরোধ করিয়া বিদায় লইল। মদনিকা প্রতিশ্রুতি দিল সে আবার আসিবে। আরও বলিল যে সে মরুদেশ হইতে সঙ্গে করিয়া মহারাজ মানসিংহের এক আলেখ্য আনিয়াছে। কৃষ্ণার ইচ্ছা হইলে তাহাও লইয়া আসিবে।

কৃষ্ণা চলিয়া গেল। মদনিকা ফিরিল। নানা চিন্তা তাহার মনে ভিড় করিতেছে। কৃষ্ণার রূপ মনের মধ্যে কেবলই জাগিয়া উঠিতেছে। মদনিকা এমন লাবণ্যময় মনোহর রূপ জীবনে দেখে নাই। বিলাসবতীকে সে সুন্দরী জানিত; কিন্তু কৃষ্ণার সঙ্গে তাহার তুলনাই হয় না। কৃষ্ণার রূপও যেমন গুণও তেমনি। রূপে গুণে মদনিকা মোহিত

হইয়া গিয়াছিল। যাহাই হউক কৃষ্ণাকে মানসিংহের কথা বলিয়া ভুলাইবার জন্যই সে তাহার কাছে গিয়াছিল, তাহার উদ্দেশ্যও সফল হইয়াছে। মদনিকা নিশ্চিত জানিত যে কৃষ্ণকুমারীর নামে সে যে পত্র লিখিয়াছিল তাহা পাইয়া রাজা মানসিংহ নিশ্চিন্ত থাকিবেন না, তিনিও ইতিমধ্যেই দূত পাঠাইয়া থাকিবেন।

এদিকে ধনদাস রাজা ভীমসিংহের সহিত দেখা করিয়া সব প্রায় ঠিকঠাক করিয়া ফেলিল। রাজার তাহাকে বড় ভাল লাগিয়া গেল। তিনি তো ধনদাসের আসল পরিচয় জানেন না। কথাবার্তা শুনিয়া সে যে একজন গুণবান ও বহুদর্শী ব্যক্তি এইরূপই তাঁহার ধারণা হইল। ধনদাস ভীমসিংহের নিকটে রাজা জগৎসিংহের বহু প্রশংসা করিল। আর তিনিও লোকমুখে জয়পুরের রাজার বহু গুণগান শুনিয়াছিলেন, তাহা ছাড়া জগৎসিংহ তাঁহার পরমাত্মীয়। দুইবংশে বহুবার বিবাহ হইয়াছে। সুতরাং কৃষ্ণাকে আর জগৎসিংহের হাতে সমর্পণ করিতে বাধা কি? রাজা তাঁহারই সঙ্গে কন্যার বিবাহ-সম্বন্ধ স্থির করিয়া ফেলিলেন। রানী ও তপস্বিনী ভাবিলেন ভগবান একলিঙ্গের আশীর্বাদে এই বিবাহের প্রস্তাব আসিয়াছে। এখন শুভস্য শীঘ্রম্। বিবাহ যত শীঘ্র হয় ততই মঙ্গল। তপস্বিনী ঠিক করিলেন বিবাহকার্য সুসম্পন্ন হইলেই তিনি তীর্থযাত্রায় বাহির হইবেন। কন্যার সঙ্গে বিচ্ছেদ আসন্ন ভাবিয়া অহল্যা দেবীর দুই চোখ ভরিয়া জল আসিল।

রাজা ও তপস্বিনী বহু চেষ্টাতেও তাঁহাকে শান্ত করিতে পারিলেন না।

মদনিকা যাহা আশা করিয়াছিল তাহাই ঘটিল। কৃষ্ণার নামে লিখিত পত্র পাইয়াই রাজা মানসিংহ এক দূত পাঠাইলেন। যথাসময়ে দূত আসিয়া উপস্থিত হইল। সে সংবাদ রাজকুমারীর কানে পৌঁছিতেও বিলম্ব হইল না। কৃষ্ণা স্বস্তির নিশ্বাস ফেলিয়া ভাবিল তবে দূতী ঠিকই বলিয়াছে, এ দূত তাহারই জন্য আসিয়াছে। কিন্তু একটা চিন্তা তাহাকে বড় পীড়িত করিয়া তুলিল। মানসিংহ তাহার পাণিপ্রার্থনা করিয়া দূত পাঠাইয়াছেন। এদিকে রাজা জগৎসিংহের নিকট হইতেও বিবাহের প্রস্তাব আসিয়াছে। এখন পিতা কি ঠিক করেন! তাহার ভারী ভয় হইতে লাগিল।

মদনিকা শুনিল একজন দূত আসিয়া সদ্য পৌঁছিয়াছে, কিন্তু সে যে মরুদেশের দূত সে খবর তখনও পায় নাই। তাহার মন চঞ্চল হইয়া উঠিল। আসল খবরটা জানিবার জন্য সে উদ্‌গ্রীব হইয়া উঠিল। যদি মানসিংহের দূত হয়, ভগবান যদি তাহাই করেন, তবে আর মদনিকাকে পায় কে? ধনদাসের সকল প্রয়াস ব্যর্থ হইবে। ভাবিতে তাহার মন আনন্দে, গর্বে, উৎসাহে ভরিয়া উঠিল। মদনিকা দেখাইয়া দিবে যে, ধনদাসই পৃথিবীতে একমাত্র চতুর ব্যক্তি নয়। দেখাইবে যে, যে নারীকে ধনদাস এত অবহেলা করে সেই নারীরই শক্তি কতখানি। ধূর্তচূড়ামণির গর্ব খর্ব করিয়া সে ছাড়িবে। কিন্তু

এত ব্যস্ত হইলে চলিবে না। বুঝিয়া সুঝিয়া আট ঘাট বাঁধিয়া ধীরে ধীরে অগ্রসর হইতে হইবে।

মদনিকা চিত্রপট লইয়া কৃষ্ণার সঙ্গে দেখা করিতে গেল। সে বলিয়াছিল, মরুরাজ মানসিংহের এক প্রতিকৃতি সে লইয়া আসিয়াছে; কিন্তু আসলে মানসিংহের কোনও চিত্র তাহার কাছে ছিল না, আর থাকিবেই বা কি করিয়া? সে যাহাই হউক মদনিকা একটি সুন্দর চিত্র জোগাড় করিয়া লইয়াছিল। মনে মনে সে ভাবিয়াছিল এ চিত্র নাই বা হইল মানসিংহের, ক্ষতি কি? কাঠের বিড়াল হউক না কেন ইঁদুর ধরিতে পারিলেই হইল।

কৃষ্ণার সঙ্গে দেখা হইতে রাজকুমারীই তাহাকে সঠিক সংবাদটা জানাইয়া দিল। এ দূত যে মরুদেশ হইতে আসিয়াছে, তাহাতে আর কোনও সন্দেহ রহিল না। মদনিকা বড় খুশী হইয়া উঠিল। কৃষ্ণার মনে কিন্তু শুধু আনন্দই ছিল না। একটা ভীষণ চিন্তা বারবার তাহার মনকে অশান্ত করিয়া তুলিতেছিল। জয়পুরের রাজাও তাহার জন্য দূত পাঠাইয়াছেন সুতরাং তাহাকে লইয়া যে একটা বিষম বিবাদ বাধিয়া উঠিবে তাহাতে আর তিলমাত্র সন্দেহ নাই। ভয়ে, ভাবনায় কৃষ্ণা বিমর্ষ হইয়া পড়িল।

রাজকুমারীর মনোভাব বুঝিতে মদনিকার বিলম্ব হইল না। সে সাহস দিয়া বারবার বলিতে লাগিল যে ইহাতে চিন্তার কিছুই নাই; কারণ রাজা মানসিংহ তো আর

কাহাকেও ভয় করিয়া চলেন না। পৃথিবীতে তাঁহার সমান বীর নাই। রাজা জগৎসিংহ তো কোন ছার! ইচ্ছা করিলে মরুরাজ মূহূর্তের মধ্যে জয়পুর ভস্ম করিয়া দিতে পারেন। রাজকুমারী যদি তাঁহার অনুরাগিণী হন, তবে আর তাঁহাকে পায় কে?

আশায়, আনন্দে কৃষ্ণার বুক ভরিয়া উঠিল। মনে মনে ভাবিল, হে ভগবান, দূতীর কথাই যেন সত্য হয়। সে মদনিকাকে একবার তাহাদের রাজদূতের সহিত দেখা করিবার জন্য অনুরোধ করিল।

রাজকুমারীর কাছে বিদায় লইয়া মদনিকা বাহির হইয়া পড়িল, যাইবার আগে কৃষ্ণাকে মহারাজ মানসিংহের জাল চিত্রপটখানি দিয়া যাইতে ভুলিল না। কহিল, কৃষ্ণার কাছে উহা থাক, সে পরে আবার আসিয়া লইয়া যাইবে।

ছবির দিকে তাকাইয়া কৃষ্ণা তো অবাক। দূতী রাজা মানসিংহের রূপ সম্বন্ধে যে সকল কথা বলিয়াছিল তাহার কোনটিই মিথ্যা নয়। রাজা মানসিংহ সত্যই অসাধারণ রূপবান্। কৃষ্ণা অপলকনয়নে ছবির দিকে তাকাইয়া রহিল। দেখিয়া দেখিয়া সাধ আর মিটে না। চিত্রটি লইয়া রাজকুমারী আপনার ঘরের দিকে চলিল।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

১

স্ত্রীলোকের বেশ পরিত্যাগ করিয়া মদনিকা আবার পুরুষের বেশ ধরিল এবং মরুরাজ মানসিংহের যে দূত উদয়পুরে আসিয়াছিল তাহার সঙ্গে দেখা করিতে গেল। দূত ভাবিল, সে একজন উদয়পুরের অধিবাসী। মদনিকা তাহাই বলিয়াছিল। কৃষ্ণার নামে মহারাজ মানসিংহের নিকট পত্র গেলেও সকলে সেকথা ঠিক যেন বিশ্বাস করে নাই। এই দূতটিও একথা সম্পূর্ণ বিশ্বাস করিতে পারিতেছিল না। রাজকুমারী কৃষ্ণা যে মানসিংহকে অমন করিয়া পত্র লিখিবেন এ যেন তাহাদের কল্পনার অতীত। কিন্তু মদনিকার মুখে দূত যখন সমস্ত কথা শুনিল, তখন সে একেবারে অবাক হইয়া গেল। কথাটা আগে সে বিশ্বাস করে নাই বটে; কিন্তু এখন আর তাহার মনে কোনও সন্দেহই রহিল না।

মদনিকা তাহাকে বলিল যে, পত্রখানি লিখিয়া রাজকুমারী প্রথমে তাহারই হাতে দিয়াছিল। পরে সে একজন বিশ্বাসী লোক দিয়া মরুদেশে পাঠাইয়া দেয়। দূত সমস্ত শুনিয়া অতিশয় বিস্মিত হইল। ভাবিল, তাহাদের রাজা সত্যই মহা ভাগ্যবান নহিলে কি আর এমনটি ঘটে! কেহ মহামণির লোভে অন্ধকারময় খনিতে প্রবেশ করে, আবার কেহ তাহা

পথে কুড়াইয়া পায়। এ সমস্তই কপাল গুণে ঘটে। কত দেশের কত রাজা মহারাজা রাজকুমারীকে বিবাহ করিবার জন্য ব্যাকুল হইয়া কত চেষ্টাই করিতেছেন; কিন্তু মরুরাজ মানসিংহ অনায়াসেই তাঁহার প্রীতিলাভ করিলেন। দূত পত্রের কথা বিশ্বাস করিয়াছে দেখিয়া মদনিকা খুশী হইল বটে; কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে তাহার মনে এক শঙ্কাও জাগিয়া উঠিল। পত্রের কথা দূত যদি এ দেশে বলিয়া দেয়! তাহা হইলে রাজকুমারীর বিপদের আর শেষ থাকিবে না।

এই সব চিন্তা করিয়া দূতকে মদনিকা পত্রের কথা কাহারও কাছে প্রকাশ করিতে নিষেধ করিয়া দিল। দূত হাসিয়া জানাইল, সে কি এত বড় নির্বোধ যে এ সংবাদ লোকের কাছে বলিয়া বেড়াইবে! পত্রের কথা প্রকাশ পাইলে রাজকুমারী যে লজ্জা পাইবেন এ জ্ঞান তাহার আছে। নিতান্ত গণ্ডমূর্খ না হইলে কি কেহ একথা কাহারও কাছে বলে? দূতের কথা শুনিয়া মদনিকা সম্পূর্ণ আশ্বস্ত হইল। এই সুযোগে সে আর একটি কথা পাড়িল। মদনিকার খুবই ইচ্ছা যে ধূর্ত ধনদাসকে বেশ একটু অপমান করাইয়া লয়। মরুদেশের দূতের নিকট সে জয়পুরের দূত ধনদাসের খুব নিন্দা করিল। ধনদাস যে মরুরাজ মানসিংহের কুৎসা রটনা করিতেছে এবং যাহা ইচ্ছা তাহাই বলিতেছে একথা মদনিকা খুব ফলাও করিয়া বলিল। কহিল, মানসিংহ মরুদেশের প্রকৃত অধীকারী নহেন ইহাই ধনদাসের অভিমত।

রাজার নিন্দা শুনিয়া দূত চটিয়া গেল। বলিল,—কি? ছোট মুখে বড় কথা! ধনদাসকে উপযুক্ত শিক্ষা দিতে হইবে! মদনিকা নিষেধ না করিলে সে হয়তো ধনদাসের মাথাটাই ভাঙিয়া ফেলিত। মদনিকা বলিল,—মহাশয়, এত রাগ করিলে চলিবে না; ধনদাস দূত, ভীমসিংহের অতিথি। উহার গায়ে হাত তোলাটা সংগত হইবে না। তবে প্রয়োজন হইলে মুখেই দু-চার কথা শুনাইয়া দিতে পারেন।

দূত ভাবিল, তাহাই ভাল। সুযোগ পাইলে ধনদাসকে এমন অপমান করিবে যেন সে আর কোনও দিন মিথ্যা বড়াই করিয়া ফিরিতে না পারে।

গোলযোগ বাধাইয়া দিতে মদনিকার মত পটু আর কে আছে? সে যে সমস্ত ফন্দি আঁটিয়াছিল, সমস্তই সফল হইতে চলিল। কিন্তু একটা ভাবনা তাহাকে পীড়িত করিয়া তুলিতেছিল। রাজকুমারী কৃষ্ণাকে দেখিয়াই মদনিকা তাহাকে ভাল না বাসিয়া পারে নাই। কৃষ্ণাকে দেখিয়াই তাহার মনে হইল, সে যেন কত নিজের লোক, যেন কত দিনের পরিচিত। রাজকুমারীর মিষ্ট কথাবার্তা শুনিয়া সে একেবারে মোহিত হইয়া গিয়াছিল। মদনিকার কৃষ্ণাকে যে কত ভাল লাগিয়া গিয়াছিল, তাহার ঠিক নাই। এখন গোলযোগ বাধাইয়া দিয়া সে ভাবিতে লাগিল, হায় ইহাতে কৃষ্ণার কোনও ক্ষতি হইবে না তো!

ধনদাসের সহিত মদনিকা অর্থাৎ মদনমোহনের আর একবার দেখা হইয়াছিল। দেখা হইবামাত্র ধনদাস অঙ্গুরীটির

কথা জিজ্ঞাসা করিল। সেটি মদনমোহনের হাতে ছিল না। মদনমোহন সসংকোচে বলিল,—আজ্ঞে সেটি আমার কাছে নাই। শুনিয়া ধনদাস চমকিয়া উঠিল। সে ভাবিয়াছিল, যেমন করিয়া হউক ভুলাইয়া ফুসলাইয়া অর্থ দিয়া অঙ্গুরীটি ফিরাইয়া লইবে ; কিন্তু অঙ্গুরী তাহার কাছে নাই শুনিয়া সে ভয় পাইয়া গেল। ভাবিল, তবে হয়তো সে উহা হারাইয়া ফেলিয়াছে। কিন্তু পরে মদনের কথা শুনিয়া বুঝিল যে উহা হারাইয়া যায় নাই। মদনিকা নামে মদনমোহনের একটি বিশেষ বন্ধু আছে। তাহাকেই সে দিয়া দিয়াছে।

ধনদাস ভাবিল, কি সর্বনাশ! অমন মহামূল্য অঙ্গুরী কি কাহাকেও দিতে হয়! হায় হায়, আংটিটি ফিরিয়া পাইবার আশা চিরতরে লুপ্ত হইল! কিন্তু পরমূহূর্তে'ই ধনদাসের মাথায় এক বুদ্ধির উদয় হইল। ভাবিল, ঐ মদনিকার বাড়ীটা কোথায় জানিতে পারিলেই তো হয়! মেয়েমানুষ, কিছু অর্থ দিলে নিশ্চয় অঙ্গুরীটি ফিরাইয়া দিবে। কিন্তু মুশকিল হইল, মদনমোহন কিছুতেই স্পষ্ট করিয়া বলিল না মদনিকা কোথায় থাকে। অনেক চেষ্টা করিয়া ধনদাস শুধু এইটুকু জানিল যে গড়ের বাহিরে তাহার বাস। মদনমোহনকে সে অনেক বার অনুরোধ করিল, কিন্তু কোনও ফলই হইল না।

তাহারা যে পথে দাঁড়াইয়া গল্প করিতেছিল, সেই পথ দিয়া মন্ত্রী সত্যদাস আসিতেছিলেন, সঙ্গে মরুরাজ মানসিংহের দূত।

তাহাদিগকে দেখিতে পাইয়া মদনমোহন সরিয়া পড়িল। ধন-দাসের কোনও কথাই আর জানা হইল না।

তাহাকে দেখিয়াই মন্ত্রী সত্যদাস মরুদেশের দূতের সঙ্গে আলাপ করাইয়া দিলেন। ধনদাসের উপর সে পূর্ব হইতেই হাড়ে হাড়ে চটিয়া ছিল, কাছে পাইয়া তাহার সর্বাঙ্গ জ্বলিতে লাগিল। ভাবিল, এই অবসরে ইহাকে দু-কথা শুনাইয়া দেওয়া যাক।

মরুদেশের দূত প্রথমে ধীরে ধীরে ধনদাসকে বলিল,—মহাশয়, আমরা যখন দুজনেই একটি অমূল্য রত্নের আশায় এ দেশে আসিয়াছি, তখন পরস্পরের মধ্যে প্রতিদ্বন্দ্বিতার ভাব থাকা স্বাভাবিক, কিন্তু তাই বলিয়া আমাদের পক্ষে কি পরস্পরের প্রতি কোনও অসৌজন্য প্রদর্শন করা উচিত?

ধনদাস বেচারী সত্যই কিছু বলে নাই। মরুদেশের দূতের কাছে মদনিকা মিথ্যা করিয়াই কথা বলিয়াছিল। কাজেই দূতের কথাগুলি ধনদাস কিছুই বুঝিতে পারিল না। ভাল মানুষের মত বলিল,—আজ্ঞে তাও কি উচিত?

একথা শুনিয়া মরুদেশের দূত আরও চটিয়া গেল। ভাবিল, লোকটা তো ভণ্ডামি বেশ জানে দেখিতেছি। আড়ালে মানসিংহের এত নিন্দা করিয়া এখন বেশ ভাল মানুষ সাজিতেছে। সে জানাইয়া দিল যে ধনদাস রাজা মানসিংহ সম্বন্ধে যে সমস্ত নিন্দা করিয়া বেড়াইতেছে তাহার কিছুই শুনিতে তাহার বাকী নাই। ধনদাস আকাশ হইতে পড়িল।

সে কি নিন্দা করিয়াছে? কখন নিন্দা করিল? সে যতই অস্বীকার করে, যতই প্রতিবাদ করে, মরুদেশের দূত ততই ক্ষেপিয়া উঠে। প্রাণপণ চেষ্টা করিয়াও ধনদাস প্রমাণ করিতে পারিল না যে সে মানসিংহের বিরুদ্ধে কিছুই বলে নাই। মরুরাজের দূত ক্রোধে কাঁপিতে কাঁপিতে ধনদাসকে যথেচ্ছ তিরস্কার করিল এবং সত্যদাসের সম্মুখেই রাজা জগৎ-সিংহের বিদ্যাবুদ্ধি এবং স্বভাবচরিত্র সম্বন্ধে এমন কয়েকটি কথা শুনাইয়া দিল, যাহাকে কোনক্রমেই শ্রুতিমধুর বলা চলে না।

দুইজনে মহাগণ্ডগোল বাধিয়া গেল দেখিয়া মন্ত্রী সত্যদাস বড়ই বিপদে পড়িলেন। বুঝাইয়া সুঝাইয়া দুইজনকে থামাইতে চেষ্টা করিলেন বটে, কিন্তু কোনও ফলই হইল না। শেষে রাজভ্রাতা বলেন্দ্র সিংহ আসিয়া নানাকথায় দুইজনের বিবাদ বন্ধ করিলেন। অতি কষ্টে গণ্ডগোল মিটিল। তখন সকলে মিলিয়া রাজসভার দিকে যাত্রা করিলেন।

উদয়পুরে মদনিকার যে উদ্দেশ্যে আসা তাহা সিদ্ধ হইয়াছে, তাহার কৌশলে রাজকুমারী কৃষ্ণা রাজা মানসিংহকেই বিবাহ করিতে ইচ্ছুক হইয়াছে, এমন কি জগৎসিংহের নামও সহ্য করিতে পারিতেছে না। পত্র পাইয়া রাজা মানসিংহও ব্যাকুল হইয়া দূত পাঠাইয়াছেন। এখন রাজা জগৎসিংহের অবস্থা শোচনীয়। কৃষ্ণাকে বিবাহ করা তাঁহার পক্ষে প্রায় অসম্ভব হইয়া উঠিয়াছে। ধনদাসের সমস্ত উদ্দেশ্য ব্যর্থ হইতে-চলিয়াছে। উদয়পুরে সে ঘটকালি করিতে আসিয়াছিল; সে

ঘটকালি তো নিষ্ফল হইলই, তাহার উপর মানসিংহের দূতের নিকট যে লাঞ্ছনা লাভ করিল তাহা জীবনে কখনও ভুলিতে পারিবে না। অপমানের তো একশেষ হইয়াছেই আবার রাজার দেওয়া মহামূল্য অঙ্গুরীটিও হারাইয়াছে। মদনিকা দেখিল, সবই যখন হইল তখন আর বৃথা সময় নষ্ট করা উচিত নয়। কৃষ্ণাকে ছাড়িয়া যাইতে তাহার প্রাণ কাঁদিয়া উঠিল, কিন্তু কি করিবে? উপায় নাই। মদনিকা উদয়পুর ত্যাগ করিয়া জয়পুরের দিকে রওনা হইল। ধনদাসের পূর্বেই তাহার জয়পুরে পৌঁছানো চাই।

২

মদনিকা চলিয়া গেল ; কিন্তু যাইবার আগে কৃষ্ণার সঙ্গে দেখা করিয়া গেল না। কৃষ্ণা তাহাকে আর দেখিতে না পাইয়া ব্যাকুল হইয়া তাহার সন্ধানে লোক পাঠাইল। কিন্তু লোক পাঠাইলে কি হইবে, মদনিকা কি আর দেশে আছে ? লোক ফিরিয়া আসিল।

কৃষ্ণা দূতীর অন্তর্ধানের কোনও কারণ খুঁজিয়া পাইল না। সে বিস্মিত হইয়া ভাবিতে লাগিল, দূতী গেল কোথায় ?

কৃষ্ণা দূতীর কথা শুনিয়া রাজা মানসিংহকেই বিবাহ করিবে মনস্থ করিয়া ফেলিয়াছিল। রাজা জগৎসিংহের নিন্দা সে দূতীর মুখে কম শুনে নাই। কিন্তু দু-জনেই তো তাহাকে বিবাহ করিতে চান। কৃষ্ণার মন চিন্তায় ভরিয়া উঠিল, ভাবিল শেষ পর্যন্ত কি হয়! পিতা কি করেন! কিন্তু জগৎসিংহকে বিবাহ করিতে হইবে, এ কথা কৃষ্ণা ভাবিতেও পারে না। পাছে জগৎসিংহকে বিবাহ করিবার জন্য পিতা পীড়াপীড়ি করেন এই ভয়ে সে ভগবতী তপস্বিনীকে একদিন মনের কথা বলিয়া ফেলিল। কথাটা প্রকাশ করিয়া কিন্তু তাহার বড় খারাপ লাগিল, এমন লজ্জা করিতে লাগিল যে মা অথবা তপস্বিনীকে আর মুখ দেখাইতেও ইচ্ছা হইল না। উঁহাদিগকে দেখিয়াই সে পলাইতে চেষ্টা করিত!

ভগবতী শুনিয়া একটু অবাক হইলেন। তাঁহার মনে চিন্তাও কম হইল না। এখন যদি রাজা জগৎসিংহের সঙ্গেই বিবাহ ঠিক হয় তবে তো মহাবিপদ। তাঁহার মন অশান্তিতে পূর্ণ হইল। অশান্তির আরও একটু কারণ ছিল। তিনি ভগবান গোবিন্দরাজের মন্দিরে ধ্যানস্থ হইয়া কৃষ্ণকুমারীর সম্বন্ধে একটা দুঃস্বপ্ন দেখিয়াছেন। আর, যাহা যাহা ঘটিতেছে তাহাতেও আশঙ্কার কারণ কম হয় নাই। দুই মহারাজা রাজকুমারীর পাণিপ্রার্থী হইয়া দূত পাঠাইয়াছেন, তাঁহারা কি এখন বিনা যুদ্ধে নিরস্ত হইবেন? আর তাঁহাদের বিবাদে কি উদয়পুরের রক্ষা থাকিবে? তপস্বিনী দেখিলেন যে কৃষ্ণার মনের কথা রানীকে বলা উচিত, নহিলে কৃষ্ণার জীবন দুঃখময় হইবার সম্ভাবনা। অহল্যা দেবী সমস্ত কথা শুনিয়া বিস্মিত হইয়া গেলেন। ভাবিলেন, সেইজন্যই কৃষ্ণাকে এই কয় দিন কেমন চিন্তিত ও ক্লিষ্ট দেখাইতেছে। সেইজন্যই তাহার মুখে হাসি নাই, মন সব সময় বিষাদে ভারাক্রান্ত।

রাজকুমারী যে মরুরাজ মানসিংহকেই বিবাহ করিতে চায়, এ কথা শুনিয়াই অহল্যাদেবীর মুখ শুকাইয়া গেল। তিনি জানিতেন, মহারাজ ভীমসিংহের সঙ্গে মরুরাজের মোটেই সদ্ভাব নাই, তিনি কিছুতেই কন্যাকে তাঁহার হাতে দিবেন না। তাহার উপর আবার জয়পুররাজ জগৎসিংহ তাঁহার পরমাত্মীয়, আর তাঁহার দূতও আগে আসিয়াছে। সুতরাং মানসিংহের

সঙ্গে বিবাহ হওয়ার আর কোনও আশাই নাই। ভয়ে দুঃখে অহল্যাদেবীর চোখে জল আসিল। অবিরত তিনি কাঁদিতেই লাগিলেন। রাজকুমারী মাতাকে কাঁদিতে দেখিয়া বিষণ্ণ হইত, কিন্তু কান্নার কারণ ঠিক বুঝিতে পারিত না। ভাবিত, তাহার বিবাহ হইলে সে চলিয়া যাইবে, সেই দুঃখেই বুঝি জননী কাঁদিতেছেন।

অহল্যাদেবী আর থাকিতে না পারিয়া একদিন রাজাকে বলিয়াই ফেলিলেন যে, কৃষ্ণাকে রাজা মানসিংহের হাতেই সমর্পণ করিলে ভাল হয়। এ কথা শুনিয়া রাজা অত্যন্ত বিস্মিত হইলেন। তিনি এমন কথা ভাবিতেও পারেন নাই। রাজা জগৎসিংহ তাঁহার পরমাত্মীয়, তাহার উপর তাঁহার দূতই আগে আসিয়াছে; তাঁহাকে নিরাশ করিবেন কি করিয়া? আর রাজা মানসিংহকে তিনি বিশেষ পছন্দও করিতেন না। কেন যে রানী এমন অন্যায় অনুরোধ করিতেছেন তাহা রাজা কিছুতেই বুঝিতে পারিলেন না। রানীও ভয়ে কৃষ্ণার ইচ্ছার কথা বলিতে পারিলেন না।

একে তো রাজকুমারীকে লইয়া দুই রাজা প্রায় যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হইয়াই আছেন। উদয়পুরের পক্ষে তাহা কম বিপদের কথা নহে। তাহার উপর আর এক মহাসংকট উপস্থিত। মহারাষ্ট্রের অধিপতি আবার উড়িয়া আসিয়া জুড়িয়া বসিয়াছেন। তিনি রাজা মানসিংহের পক্ষ অবলম্বন করিয়াছেন। মহারাষ্ট্ররাজ অর্থ পাইয়া স্বদেশে ফিরিয়া

যাইতে উদ্যত ছিলেন; কিন্তু পুনরায় একটা ছুতা পাইয়া স্বার্থসিদ্ধির চেষ্টায় মাতিয়াছেন। এখন মহারাজ ভীমসিংহ যদি মানসিংহের সহিত কন্যার বিবাহ না দেন তবে মহারাষ্ট্রীয় দস্যুদল দেশ লুঠ করিতে আরম্ভ করিবে, দেশের সুখ সম্পদ সমস্ত বিনষ্ট করিয়া শ্মশানে পরিণত করিবে।

ভীমসিংহ যে কি করিবেন কিছুই ভাবিয়া পাইলেন না। তাঁহার কতটুকু শক্তি যে ইহাদের আক্রমণ হইতে দেশকে রক্ষা করিবেন! ভাবিয়া ভাবিয়া তাঁহার শরীর কৃশ হইল, চোখের কোণে কালি পড়িল। হায়, কুমারী কৃষ্ণা তাঁহার কত আদরের কত সাধের একমাত্র সন্তান! তাহাকে উপলক্ষ্য করিয়া যে এতবড় বিপদ উপস্থিত হইবে তাহা তিনি স্বপ্নেও ভাবিতে পারেন নাই। রাজা ভাবিলেন, কৃষ্ণা বুঝি সতীর মত আপন পিতার সর্বনাশ করিতেই পৃথিবীতে আসিয়াছে।

এদিকে একদিন এক অদ্ভুত ব্যাপার ঘটিল। রাজকুমারী কৃষ্ণা এই কদিন একটু চঞ্চল হইয়া উঠিয়াছিল। কিছুই তাহার ভাল লাগিতেছিল না। রাজা মানসিংহের কথা শুনিয়া ও মদনিকার দেওয়া চিত্র দেখিয়া সে তাঁহাকেই স্বামী বলিয়া মনে মনে বরণ করিয়াছিল। কিন্তু পিতা ভীমসিংহের ইচ্ছা নয় যে, রাজা মানসিংহের সঙ্গে কৃষ্ণার বিবাহ হয়। দেশের অবস্থাও মহাসংকটজনক। সব দেখিয়া শুনিয়া কৃষ্ণার বড় ভয় করিতে লাগিল। সেই মানসিংহের দূতীটি যে পাখীর মত কোথায় পলাইয়া গেল, তাহারও আর কোনও সন্ধান মিলিল না।

একদিন দূতীর কথা ভাবিতে ভাবিতে সে বাগানের দিকে যাইতেছিল হঠাৎ কোথা হইতে এক স্বর্গীয় সৌরভ ভাসিয়া আসিল। কৃষ্ণা বিস্মিত হইয়া ভাবিতে লাগিল এমন সুমিষ্ট পদ্ম-গন্ধ কোথা হইতে আসে? এদিকে ওদিকে চাহিল, কিন্তু কোথাও পদ্ম নাই। ব্যাপারটা সে কিছু বুঝিয়া উঠিতে পারিল না। সহসা তাহার সর্বাঙ্গ শিহরিয়া উঠিল, তাহার পা দুইটি যেন নিশ্চল হইয়া গেল। চলিবার শক্তি পর্যন্ত রহিল না। হঠাৎ কৃষ্ণা যেন আকাশে সুমধুর বাদ্যধ্বনি শুনিতে পাইল। উপর দিকে তাকাইতেই কি যেন তাহার দৃষ্টিতে পড়িল; আর সঙ্গে সঙ্গে সংজ্ঞা হারাইয়া রাজকুমারী মাটিতে পড়িয়া গেল।

পতনের শব্দ শুনিতে পাইয়াই তপস্বিনী ছুটিয়া আসিলেন। সম্মুখে যাহা দেখিলেন তাহাতে তাঁহার মুখ শুকাইয়া গেল। রাজকুমারী কৃষ্ণা মূর্ছিত হইয়া মাটিতে পড়িয়া আছে। ভাগ্যে তপস্বিনী এইদিক দিক দিয়া যাইতেছিলেন, নহিলে কতক্ষণ যে পড়িয়া থাকিত কে জানে? তাড়াতাড়ি তিনি কাছে আসিয়া তাহাকে কোলে তুলিয়া লইলেন এবং মাথায় হাত বুলাইয়া দিতে দিতে ধীরে ধীরে নাম ধরিয়া ডাকিলেন। কৃষ্ণা কিন্তু জ্ঞান তখনও ফিরিয়া পায় নাই। অজ্ঞান অবস্থা-তেই সে কি যেন বলিতে লাগিল। তপস্বিনী বুঝিলেন কৃষ্ণা অসুস্থ হইয়া ভুল বকিতেছে। তিনি আবার কৃষ্ণার নাম ধরিয়া ডাকিলেন।

এবার তাহার জ্ঞান ফিরিয়া আসিল। সে চোখ মিলিয়া চাহিয়া ভগবতীকে দেখিয়াই একটু অবাক হইল। ভাবিল ভগবতী আবার এখানে আসিলেন কি করিয়া ? আসলে তাহার মনে ছিল না যে সে বাগানে আছে। ভগবতীকে এ কথা বলিতেই তিনি বলিলেন যে কৃষ্ণা তাহার বাগানে আছে এবং তিনি এইখানে কৃষ্ণাকে মূর্ছিত অবস্থায় পড়িয়া থাকিতে দেখেন। শুনিয়া কৃষ্ণা চারিদিকে একবার ভাল করিয়া চোখ বুলাইয়া লইল। দেখিল সত্যই সে তাহার উদ্যানে রহিয়াছে।

কৃষ্ণা কহিল,—ভগবতী, আমি এতক্ষণ একটা অদ্ভুত স্বপ্ন দেখিতেছিলাম।

বিস্মিত হইয়া ভগবতী কহিলেন,—কি স্বপ্ন মা ?

কৃষ্ণা বলিতে লাগিল,—আমার বোধ হইল আমি যেন কোনও সুবর্ণমন্দিরে একখানি কোমল আসনে বসিয়া রহিয়াছি এমন সময়ে একটি পরমাসুন্দরী স্ত্রী একটি পদ্ম হাতে করিয়া আমার সম্মুখে দাঁড়াইলেন। দাঁড়াইয়া বলিলেন, বাছা, তুমি আমাকে প্রণাম কর, সম্পর্কে আমি তোমার জননী হই।

তপস্বিনী এ সমস্ত কথা শুনিয়া অবাক হইয়া গিয়াছিলেন। কহিলেন,—তাহার পর ?

কৃষ্ণা ধীরে ধীরে উত্তর দিল,—তাহার পর আমি প্রণাম করিলাম। তিনি বলিলেন,—দেখ বাছা ! যে রমণী এই বিপুল কুলের মান আপন প্রাণ দিয়া রাখে, স্বর্গপুরে তাহার

আদরের সীমা থাকে না। আমি এই কুলেরই বধূ, আমার নাম পদ্মিনী। তুমি যদি আমার মত কাজ কর তাহা হইলে আমারই মত যশস্বিনী হইবে। কৃষ্ণা থামিল, তাহার সর্ব-শরীর কাঁপিতে লাগিল, সে যেন আর বসিয়া থাকিতে পারিতেছিল না। ভগবতী তপস্বিনী কৃষ্ণাকে ধরিয়া অন্তঃপুরের দিকে লইয়া চলিলেন। তাঁহার হৃদয় চিন্তায় ভারাক্রান্ত হইয়া উঠিল। কৃষ্ণাকে তিনি এ সমস্ত কথা আর কাহারও নিকট বলিতে নিষেধ করিলেন। অন্তঃপুরের দিকে যাইতে যাইতেও আকাশলোকের সেই মধুর সংগীত তাহার কানে ভাসিয়া আসিতে লাগিল। কিন্তু তপস্বিনী কিছুই শুনিতে পাইলেন না।

৩

মরুরাজ মানসিংহ ও জয়পুররাজ জগৎসিংহ রাজকুমারীকে বিবাহ করিবার জন্য মহারাজ ভীমসিংহের নিকট দূত পাঠাইয়াছিলেন। মহারাজ ভীমসিংহ প্রথমে ঠিক করিয়াছিলেন যে রাজা জগৎসিংহের হস্তেই রাজকুমারীকে দান করিবেন। কিন্তু অবস্থা ক্রমশঃ এমন দাঁড়াইল যে এই মত সম্পূর্ণ পরিবর্তন করিতে হইল। রাজা মানসিংহকে তিনি ভালচোখে দেখিতেন না। তাঁহাকে কন্যা দিবেন এমন চিন্তা তিনি কখনও মনে স্থান দেন নাই। কিন্তু আজ অবস্থাবিপাকে অসম্ভবই সম্ভব হইতে চলিল। মহারাষ্ট্রপতি সন্ধি করিয়া দেশে ফিরিয়া যাইবার উপক্রম করিতেছিলেন, এমন সময় যখন শুনিলেন যে দুই রাজার দূত উদয়পুরে উপস্থিত হইয়াছে, তখন তিনি বেশ বুঝিলেন যে শীঘ্রই একটা বিবাদ উপস্থিত না হইয়া যায় না। সুতরাং ধূর্ত মহারাষ্ট্রপতি এমন সুযোগ ছাড়িবেন কেন? মহারাজ মানসিংহের পক্ষে যোগ দিয়া তিনি রাজা ভীমসিংহকে অনুরোধ করিলেন, রাজকুমারীকে মরুরাজের হাতেই অর্পণ করিতে হইবে।

রাজা ভীমসিংহ দেখিলেন যে রক্ষা পাইবার যখন কোনও উপায় নাই, একজনকে হতাশ করিলে আর একজন যখন ক্ষুব্ধ হইয়া রণসাজে সজ্জিত হইবেন, তখন রাজা জগৎসিংহের দূতকে ফিরাইয়া দেওয়াই ভাল। এ কথায়

তাঁহার মন সায় দিল না, তথাপি উপায় কি? বিপক্ষে শুধু রাজা মানসিংহ নন মহাপ্রতাপশালী মহারাষ্ট্রপতিও আছেন। কাজেই দুইজন শত্রু সৃষ্টি করা অপেক্ষা একজনকে অসন্তুষ্ট করাই শ্রেয়। ভীমসিংহ ধনদাসকে দেশে ফিরিবার অনুমতি দিলেন এবং ঠিক করিলেন অল্পদিনের মধ্যেই মহারাষ্ট্রপতির সহিত ভগবান একলিঙ্গের মন্দিরে সাক্ষাৎ করিবেন। তাহার পর বিবাহের যে কি হইবে সে সম্বন্ধে কিছুই বলা যায় না।

ধনদাসের আসা একেবারে ব্যর্থ হইয়া গেল, কোনও কাজই হইল না। সে কিছু করিতে পারে নাই শুনিয়া রাজা মানসিংহ যে ক্ষুব্ধ হইবেন, সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। ধনদাস মন্ত্রী সত্যদাসকে বলিল যে জগৎসিংহ কিন্তু এ অপমানের প্রতিশোধ লইতে ছাড়িবেন না। বৃদ্ধ মন্ত্রী ধনদাসকে অনেক সান্ত্বনা দিলেন ও রাজাকে অবস্থাটা বুঝাইয়া শান্ত করিতে অনুরোধ করিলেন।

রাজার কাজ তো হইলই না, আবার অঙ্গুরীটিও গেল। ধনদাসের মন বড়ই খারাপ হইল। ভাবিল অমনি ফেরা হইবে না। কিছু লাভ করিতে হইবে। মন্ত্রী সত্যদাসের কাছে সে এক মিথ্যা কাহিনী কাঁদিয়া কহিল, এদেশে দস্যুরা তাহার সর্বস্ব লুটিয়া লইয়াছে, সে এখন নিঃস্ব। তাহা ছাড়া সে যে মরুদূতের নিকট অপমানিত হইয়াছিল তাহা তো সত্যদাসও দেখিয়াছেন। নিজের দুঃখের কথা বলিতে বলিতে ধনদাসের চক্ষু

ছলছল করিয়া উঠিল। মন্ত্রী সত্যদাস একটু দয়ালু মানুষ। তিনি ধনদাসের দুঃখে দুঃখিত হইয়া বলিলেন, পথে যাহাতে ধনদাসের কোনও কষ্ট না হয় সে ব্যবস্থা তিনি করিবেন। তাহা ছাড়া উদয়পুররাজ ধনদাসকে একটি অঙ্গুরী দিয়াছিলেন সত্যদাস সেটিও তাহার হাতে দিলেন। অঙ্গুরী পাইয়া ধনদাস মহা খুশী। নানা রত্নে খচিত অঙ্গুরী। মূল্য যে কত হইবে তাহা ঠিক করিয়া বলা যায় না; তবে লক্ষ টাকা অন্ততঃ হইবেই, এ কথা জোর করিয়া বলা যায়। যাহা হউক এইটি পাইয়া ধনদাস পূর্বের অঙ্গুরীর শোক ভুলিয়া গেল। আনন্দে তাহার চোখ দুটি জ্বলিয়া উঠিল।

মনের আনন্দে ধনদাস দেশে ফিরিল। রাজার কোনও কাজ অবশ্য হইল না; কিন্তু তাহার তো কোনও ক্ষতি হইল না।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

১

এদিকে রাজা জগৎসিংহ ধনদাস দেশে পৌঁছিবার পূর্বেই মন্ত্রীর মুখে শুনিলেন যে, কৃষ্ণকুমারীকে পাওয়ার কোনও আশা নাই। ধনদাসের সকল চেষ্টা ব্যর্থ হইয়াছে, মহারাজ ভীমসিংহ তাঁহাকে অবহেলা করিয়া মানসিংহকেই কন্যা প্রদান করিবেন স্থির করিয়াছেন। মন্ত্রী বলিলেন যে ইহার অর্থ এই নয় যে ভীমসিংহ রাজা জগৎসিংহকে যোগ্য মনে করেন না; তিনি নিতান্ত বাধ্য হইয়াই এমন কর্ম করিতেছেন। নতুবা রাজা জগৎসিংহকে তিনি আন্তরিক স্নেহ করেন।

সকল শুনিয়া রাজা একেবারে ম্রিয়মাণ হইয়া পড়িলেন। অপমান তিনি কেমন করিয়া সহ্য করিবেন। শুভাকাঙ্ক্ষী বৃদ্ধ মন্ত্রী তাঁহাকে এ কাজে হাত দিতে বার বার নিষেধ করিয়াছিলেন; কিন্তু তিনি তাহাতে কর্ণপাতও করেন নাই। আজ বোধ হয় একটু অনুতাপের উদয় হইল।

মন্ত্রীর কথায় তাঁহার চক্ষু ফুটিল। তিনি এতদিনে বুঝিলেন যে ধনদাসই এই সব অনর্থের মূল। বুঝিলেন যে ধনদাস ঘটকালি করিতে গিয়াছে তাঁহার বিবাহ ঘটাইবার

জন্য নয়—নিজের স্বার্থ সিদ্ধির জন্য। এই বিবাহের উপলক্ষে একটা গোলযোগ বাধাইয়া আপনার উদর পূর্ণ করাই তাহার উদ্দেশ্য। কপট ধূর্ত ধনদাসের চরিত্রটি আজ রাজার নিকট পরিষ্কার হইয়া গেল। তিনি এতদিন ধরিয়া এই স্বার্থান্বেষী খলচরিত্র লোকটাকেই পরম শুভাকাঙ্ক্ষী বন্ধু বলিয়া মনে করিয়াছিলেন। ইহারই পরামর্শে তিনি কত না কুকর্ম নির্বিচারে করিয়া বেড়াইয়াছেন। সে সব কথা মনে করিয়া রাজার রাগ হইতে লাগিল। ভাবিলেন, ধনদাস একবার ফিরিয়া আসুক, তাহার পর তাহাকে উপযুক্ত পুরস্কার দেওয়া হইবে।

মহারাজা ভীমসিংহকেও জগৎসিংহ কিছুতেই ক্ষমা করিতে পারিলেন না। ক্রোধে তাঁহার দুই চক্ষু রক্তবর্ণ হইল। এত বড় অপমান! তিনি ঠিক করিলেন, এ অপমান তিনি সহ্য করিবেন না। সসৈন্যে উদয়পুর রাজ্য আক্রমণ করিয়া তাহা ধ্বংস করিয়া দিবেন। রাজা মানসিংহের উপরেও রাগ হইল কম নয়। তাঁহাকেও শাস্তি দিতে হইবে। জগৎ-সিংহের মাথায় একটা ফন্দি আসিল। মরুদেশের স্বর্গীয় রাজা ভীমসিংহের পুত্র ধনকুলসিংহই মরুদেশের সিংহাসনের প্রকৃত অধিকারী; কিন্তু মানসিংহ অন্যায় করিয়া সে সিংহাসন অধিকার করিয়া বসিয়াছেন। রাজা জগৎসিংহ ঠিক করিলেন এই ধনকুলসিংহকে মরুদেশের রাজা করিবেন। এইরূপে মানসিংহের দুঃসাহসের সমুচিত দণ্ড দিবেন।

মদনিকা ফিরিয়া আসিয়া সকল কথা বিলাসবতীকে বলিল। সে উদয়পুরে যে কাণ্ড করিয়া আসিয়াছে তাহা সত্যই বিস্ময়কর। সেখানে কত লোকের সঙ্গে আলাপ করিয়াছে; মানসিংহের দূত, রাজমন্ত্রী, রাজকুমারী কেহ বাকী নাই। কতরকম সাজে সাজিয়া কতরকম বেশ ধরিয়া কত রকমের অভিনয়ই যে সে করিয়াছে তাহার ইয়ত্তা নাই। স্বয়ং ধনদাসই তাহাকে চিনিতে পারে নাই। পারিলে কি আর অঙ্গুরীটি তাহাকে দিত? উদয়পুরের লোককে সে বলিত জয়পুরে তাহার বাড়ী। জয়পুরের লোককে বলিত উদয়পুরে বাড়ী। আর যেখানে দুই দেশেরই লোক থাকিত সেখানে যাইতই না। রাজকুমারীকে সে দেখিয়াছে, কত কথা বলিয়াছে তাহার সঙ্গে। আহা! কুমারী কৃষ্ণার কি রূপ! বিলাসবতীকে মদনিকা বার বার কৃষ্ণার রূপের কথাই বলিতে লাগিল। আর ধনদাসকে সে কি জব্দই না করিয়াছে। সকল শুনিয়া বিলাসবতী তো অবাক। ওঃ মদনিকার কি বুদ্ধি!

এদিকে জয়পুরে সৈন্য সমাবেশ আরম্ভ হইল। সৈন্যে সৈন্যে দেশ একেবারে ছাইয়া গেল। তিন দিনে প্রায় নব্বই হাজার সৈন্য নগরের মধ্যে সমবেত হইয়াছে। আর ধনকুলসিংহও প্রায় আট দশ হাজার সৈন্য সঙ্গে লইয়া আসিতেছেন। রাজা মানসিংহকে শাস্তি দিতে হইবে, মহারাজ ভীমসিংহকে শাস্তি দিতে হইবে। কিন্তু তাহার

আগে শাস্তি দিতে হইবে ধূর্ত ধনদাসকে। তবে একটু বাধা আছে। রাজা এখনও পর্যন্ত তাহার কোনও দোষ স্বচক্ষে দেখিতে পান নাই। কিন্তু সে বাধাও একদিন কাটিয়া গেল। রাজা হাতে-নাতে ধনদাসের দোষ ধরিয়া ফেলিলেন।

সেদিন জগৎসিংহ বিলাসবতীর সহিত দেখা করিতে গিয়াছিলেন এমন সময় মদনিকা আসিয়া জানাইল যে ধনদাস আসিতেছে। সে রাজাকে একটু অন্তরালে যাইতে অনুরোধ করিল। রাজা জানিতেন মদনিকার বুদ্ধি কম নয়। তাহার কথামত তিনি আড়ালে গিয়া দাঁড়াইলেন। ধনদাস আসিল বিলাসবতীর সহিত দেখা করিতে।

বিলাসবতীকে দেখিয়াই ধনদাস বলিল,—মূর্খ রাজা তো যুদ্ধযাত্রা করিতেছে, যুদ্ধবিদ্যায় সে যে কত নিপুণ তাহা কে না জানে? প্রাণ লইয়া আর ফিরিয়া আসিতে হইবে না। রাজামহাশয় যুদ্ধক্ষেত্রেই গঙ্গালাভ করিবেন। অতএব চল আমরা একসঙ্গে এ দেশ হইতে পলাইয়া যাই। আমাদের দু-জনের যে সম্পত্তি আছে, তাহাতে বেশ চলিবে।

ধনদাস বিলাসবতীর দিকে চাহিয়া রহিল, বিলাসবতী কিছু বলিল না। রাজা পিছন হইতে সবই শুনিতেছিলেন। রাগে তাঁহার সর্বাঙ্গ থর থর করিয়া কাঁপিতেছিল। তিনি আর সহ্য করিতে পারিলেন না। ঝড়ের বেগে বাহির হইয়া আসিয়া ধনদাসের গলা চাপিয়া ধরিলেন।

রাজা যে এখানে থাকিবেন ইহা ধনদাস স্বপ্নেও ভাবিতে পারে নাই। কি যে বলিবে, কি যে করিবে, কিছুই ঠিক করিতে না পারিয়া সে হতভম্বের মত ফ্যালফ্যাল করিয়া চাহিয়া রহিল। জগৎসিংহ কোষ হইতে তলোয়ার বাহির করিলেন। দেখিয়া মদনিকা ও বিলাসবতী তাঁহার হাত ধরিয়া ফেলিল। বিলাসবতী বলিল,—উহাকে ক্ষমা করুন। এই ক্ষুদ্র প্রাণীর রক্তে আপনার অসি কলঙ্কিত হইবে মাত্র। সিংহ কি কখনও শৃগালকে আক্রমণ করে?

বিলাসবতী ধনদাসের প্রাণভিক্ষা না চাহিলে রাজা তখনই ধনদাসকে যমালয়ে পাঠাইয়া দিতেন। ধনদাসের ভাগ্য ভাল, তাই কোনরূপে বাঁচিয়া গেল। রাজা সেই মুহূর্তে রক্ষককে ডাকিয়া আদেশ দিলেন যেন শীঘ্রই পাষণ্ডের মাথা মুড়াইয়া, ঘোল ঢালিয়া, গালে চুনকালি দিয়া দেশান্তর করিয়া দেওয়া হয় এবং তাহার যাহা কিছু সম্পত্তি সব দরিদ্র ব্রাহ্মণগণকে বিতরণ করা হয়।

ধনদাসের আর কিছু বলিবার নাই। যে অপরাধ সে করিয়াছে, তাহাতে প্রাণ যায় নাই এই ঢের; কিন্তু প্রাণপ্রিয় ধনসম্পত্তি হাতছাড়া হইয়া গেল। ক্ষোভে, দুঃখে, শোকে তাহার বুক ফাটিয়া যাইতে লাগিল।

রক্ষক ধনদাসকে বাঁধিয়া লইয়া গেল। ধনদাসের শাস্তি দেখিয়া মদনিকা খুব খুশী হইল। বহুদিন হইতেই সে ধনদাসের এমনই শাস্তি ইচ্ছা করিতেছিল। সঙ্গিনীর বুদ্ধি দেখিয়া

বিলাসবতী বিস্মিত। বাস্তবিক মদনিকা না থাকিলে এই সমস্ত কেমন করিয়া হইত !

অদূরে রণবাদ্য বাজিয়া উঠিল। দূত আসিয়া জানাইল যে ধনকুলসিংহ আসিয়া উপস্থিত হইয়াছেন। রাজা বিলাসবতী ও মদনিকার নিকট বিদায় লইলেন। কালই যুদ্ধ যাত্রা— কে জানে কি হইবে ? ফিরিবেন কিনা ভগবানই জানেন। বিলাসবতীর চোখ দিয়া জল পড়িতে লাগিল, ভয়ে ভাবনায় তাহার অন্তর ভরিয়া গেল। রাজা তাহাকে অনেক সান্ত্বনা দিলেন। কিন্তু তাঁহার মনেও কম দুঃখ ছিল না। তিনিও ভাবিতেছিলেন, হায় এই হয়তো বিলাসবতীর সহিত শেষ দেখা।

৩

রাজ্যে মহা হলুস্থূল। ধনকুলসিংহ বহু লোকজন লইয়া আসিয়াছেন। দেশের লোকের মধ্যেও 'সাজ' 'সাজ' রব পড়িয়া গিয়াছে। সকলেই যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হইতেছে। যুদ্ধক্ষেত্রে রসদ সরবরাহের জোর ব্যবস্থা হইতেছে। কতলোক রাজপথ বাহিয়া কত জিনিসপত্র লইয়া চলিতেছে। কত সৈন্য, কত গাড়ী, কত ঘোড়া! বিলাসবতী ও মদনিকা রাজপথের পার্শ্ববর্তী এক দেবালয়ের বাতায়নের নিকটে দাঁড়াইয়া সমস্ত দেখিতেছিল। তাহারা দেবদর্শনছলে এখানে আসিয়াছে।

মদনিকা হঠাৎ লক্ষ্য করিল, ধনদাস রাজপথ দিয়া চলিতেছে। বিলাসবতীকে বলিতে সেও তাকাইল। কিন্তু এ কি? ধনদাস এ কি হইয়া গিয়াছে! মলিন বেশ, বিষণ্ণ মুখ, কোটরগত চোখ। দেখিয়া দুইজনেরই বড় দয়া হইল। ধনদাস তাহার পাপকর্মের উপযুক্ত ফলই পাইয়াছে, তাহাতে দুঃখ করিবার কিছু নাই; কিন্তু হাজার হউক নারীর প্রাণ তো! মদনিকা ধনদাসকে ডাকিল। আজ আর তাহার পূর্বের মত অহংকার নাই। অতি দীন ভাবে সে তাহাদের কাছে আসিয়া দাঁড়াইল।

মদনিকা তখন তাহাকে একটি অঙ্গুরী আপন হাত হইতে খুলিয়া দিল। অঙ্গুরী দেখিয়া ধনদাসের বিস্ময়ের

অবধি রহিল না। এ অঙ্গুরী মদনিকা কোথা হইতে পাইল? এই আংটিই তো সে উদয়পুরের মদনমোহনের হাতে দিয়াছিল। ক্রমে মদনিকার কাছে সে সব শুনিল। মদনিকার বুদ্ধি দেখিয়া সে অত্যন্ত বিস্মিত হইল। স্পষ্টই বুঝিল, আজ তাহার সকল গর্ব খর্ব হইয়া গিয়াছে। সে ভাবিত তাহার চেয়ে বুদ্ধিমান আর কেহ নাই। আজ সে দেখিল সামান্য একটা স্ত্রীলোক তাহাকে কেমন ঠকাইয়াছে! ধনদাস বুঝিল বেশী অহংকার ভাল নয়—বেশী দম্ভ করিলে ভগবান স্বয়ং সকল দম্ভ চূর্ণ করিয়া দেন। সে বুঝিল, জগতে কাহাকেও অবহেলা করিতে নাই। আর বুঝিল যে, কুকার্য করিলে তাহার ফল কখনও ভাল হয় না।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ

১

উদয়পুরে মহারাজ ভীমসিংহের নিকট সকল সংবাদই পৌঁছিতে লাগিল। রাজা মানসিংহ অসি স্পর্শ করিয়া প্রতিজ্ঞা করিয়াছেন যে, হয় তিনি রাজকুমারী কৃষ্ণাকে বিবাহ করিবেন, নয় উদয়পুর ভস্মসাৎ করিয়া দিবেন। রাজা জগৎসিংহও অনুরূপ পণ করিয়াছেন। যবনপতি আমীর আর মহারাষ্ট্রপতি মাধবজী উভয়েই রাজা মানসিংহের পক্ষে। আমীর ধনকুলসিংহের দলে ছিলেন, কিন্তু তিনি প্রবঞ্চনার আশ্রয় লইয়া ধনকুলসিংহের প্রাণনাশ করিয়া এখন আবার রাজা মানসিংহের সহায় হইয়াছেন। রাজা জগৎসিংহ ধনকুলসিংহকে হারাইয়াও প্রাণপণে যুদ্ধের আয়োজন করিতেছেন। আরও অনেক নরপতি তাঁহার পক্ষ অবলম্বন করিয়াছেন।

এই সমরের কথা শুনিয়া কত দিক হইতে কত লোক যে গর্জিয়া উঠিতেছে, তাহার সীমা নাই, তাহার উপর আবার এই বিপদ। ভীমসিংহ আজ শক্তিহীন। তাঁহার দুরবস্থার সুযোগ লইয়া সকলেই তাঁহাকে শাসাইতেছে। হায়, এমন অপমানের চেয়ে মৃত্যু ভাল। আজ শৈলরাজের বংশের কি দুরবস্থা, কি অধঃপতন! ভীমসিংহ মন্ত্রী সত্যদাস ও

ভ্রাতা বলেন্দ্রসিংহের সঙ্গে পরামর্শ করিতে লাগিলেন। মন্ত্রী আশ্বাস দিলেন, কোনও চিন্তা নাই, বিপদ কাটিয়া যাইবে। বলেন্দ্রসিংহ কহিলেন, প্রাণ দিয়াও দেশ ও বংশের মর্যাদা রক্ষা করিব। ভীমসিংহ কিন্তু কিছুতেই স্বস্তি পাইলেন না।

একদিন মন্ত্রী সত্যদাস বলেন্দ্রসিংহের হাতে এক পত্র দিলেন। পত্র পড়িয়া বলেন্দ্রের মুখ যেন মুহূর্তের মধ্যে পাণ্ডুর হইয়া গেল। তিনি কিরূপ বিহ্বল হইয়া পড়িলেন, তাঁহার সর্বাঙ্গ কাঁপিতে লাগিল। পত্রখানি একরাত্রে মন্ত্রীর হস্তগত হয়, কিন্তু কে যে এ পত্র লিখিয়াছে বা কে দিয়া গিয়াছে, তাহা তিনি জানেন না। পত্রটি পাইয়া তিনি অবাক হইয়াছেন। রাজাকে উহা দেখাইতে তাঁহার সাহস হইল না, তাই বলেন্দ্রসিংহকে পত্রটি দিলেন। মন্ত্রী বলিলেন,—পত্রের মর্ম অতি ভয়ানক এ কথা সত্য, কিন্তু এ ছাড়া আর উপায়ও তো কিছু দেখিতেছি না! বলেন্দ্র জিব কাটিয়া বলিলেন, ছি ছি ওকথা ভাবিতেও গা শিহরিয়া উঠে, ঘৃণা হয়। মন্ত্রী বলিলেন,—কর্তব্যের পথ কখনও পুষ্পাস্তীর্ণ হয় না। আপনি স্থিরচিত্তে বিবেচনা করিয়া দেখুন।

ক্রমে পত্রের কথা রাজাও জানিলেন। তিনি উহা দেখিতে চাহিলেন। পড়িয়া রাজার মুখে কথা সরিল না।

পত্রে লেখা ছিল,—দেশের মহা দুর্দিন উপস্থিত। প্রজাগণের জীবন বিপন্ন, রাজ্যের অবস্থা অতীব শোচনীয়,

রাজবংশের মান যায় যায়। এই ঘোর বিপদ হইতে উদ্ধার পাওয়া সহজ নয়। তবে সমস্ত বিপদ হইতে মুক্তি পাইবার একটিমাত্র পন্থা আছে। সে হইল রাজকুমারী কৃষ্ণার প্রাণনাশ।

কিন্তু এ যে অসম্ভব কথা। রাজকুমারীর প্রাণনাশ! নিরাপরাধা রাজকন্যাকে হত্যা! চণ্ডালেও যে একথা ভাবিতে পারিবে না। চিঠি কে লিখিয়াছে? তাহার কি হৃদয় বলিয়া কিছু নাই? সে কি মানুষ! রাজা কাতর হইয়া পড়িলেন, বলেন্দ্র পাগল হইবার উপক্রম। মন্ত্রীর হৃদয় বিদীর্ণ হইল বটে, কিন্তু তিনি দেখিলেন, এ ছাড়া আর উপায় নাই। রাজার জন্য, রাজ্যের জন্য, রাজবংশের জন্য তিনি এই অকরুণ প্রস্তাবেরই সমর্থন করিলেন। বলিলেন,—একজনের জীবন দিয়া যদি শতসহস্র জীবন রক্ষা হয় তবে তাই করিতে হইবে। অন্তর বিদ্রোহী হইয়া উঠিবে জানি, কিন্তু তাহাকে জয় করিতে হইবে। মহারাজ তো শুধু কন্যার পিতা নহেন, তিনি শতসহস্র প্রজার পিতা, তাহাদের প্রতি তাঁহার যে কর্তব্য আছে সেকথা ভুলিলে চলিবে কেন?

২

ঘোর অন্ধকার রাত্রি। আকাশে একটি তারাও নাই। একলিঙ্গের মন্দিরের সম্মুখে কয়েকজন রাজভৃত্য ও রক্ষী ঘোরাঘুরি করিতেছে। এই রাত্রে মহারাজ ভীমসিংহ কি কারণে একলিঙ্গের মন্দিরে আসিয়াছেন! তিনি খুবই অসুস্থ, বাঁচেন কি-না সন্দেহ। বার বার মূর্ছা হইতেছে। রাজবৈদ্য শম্ভুদাস ও তাঁহার শিষ্যবর্গ অনেক ঔষধপত্র দিতেছেন; কিন্তু কিশেষ কিছু ফল হইতেছে না। বলেন্দ্রও অত্যন্ত কাতর হইয়াছেন।

সহসা বলেন্দ্র মন্দির হইতে বাহির হইয়া পড়িলেন। তিনি নিজের মনেই বলিতে লাগিলেন,—না না এ কাজ আমার দ্বারা হইবে না। আমাকে এই মুহূর্তে রাজ্য ছাড়িয়া পলাইতে হইবে। ভৃত্য রঘুবরসিংহকে ডাকিয়া তিনি তাঁহার ঘোড়া আনিবার আদেশ দিলেন। এমন সময় মন্ত্রী আসিয়া তাঁহাকে ধরিয়া ফেলিলেন। অনেক অনুনয় বিনয় করিয়া কহিলেন,—আপনি এত অস্থির হইলে কি হয়? একটিবার আসুন, মহারাজ আপনাকে আর একবার ডাকিতেছেন। বলেন্দ্র চটিয়া গেলেন। তিনি হাত ছাড়াইয়া লইয়া বলিলেন,—বল কি মন্ত্রী, আমি কি চণ্ডাল! কৃষ্ণা আমার প্রাণপুত্তলিকা; আমি কেমন করিয়া তাহার প্রাণ বিনষ্ট করিব?

মন্ত্রী এ কথা লইয়া অধিক তর্কবিতর্ক করিলেন না। তিনি বহু অনুনয় করিয়া হাতে ধরিয়া বলেন্দ্রকে লইয়া গেলেন।

কিছুক্ষণ পরে মন্দির হইতে চারিজন সন্ন্যাসী বাহির হইয়া আসিলেন। তাঁহাদের মধ্যে একজন গুরু; বাকী তিনজন শিষ্য। গুরু শিষ্যদিগকে বলিতে লাগিলেন যে, তিনি আজ ধ্যাননেত্রে দেখিয়াছেন যেন দেবদেবের চক্ষে জলধারা পড়িতেছে। কিঞ্চিৎ পরে রাজভবনের প্রতি দৃষ্টিনিক্ষেপ করাতে বোধ হইল যেন সে স্থান হইতে রক্ত-স্রোত নির্গত হইতেছে। তারপর আকাশের দিকে চাহিয়া দেখিলেন যেন প্রচণ্ড অগ্নিতে লক্ষ্মীদেবী দগ্ধ হইতেছেন, এবং তাহা দেখিয়া স্বর্গে দেবগণ হাহাকার করিতেছেন। তাহার পরই কানে আসিল ভীষণ একটা মেঘগর্জনের শব্দ। তিনি বলিলেন এ সমস্তই কুলক্ষণ। নিশ্চয়ই কোনও গুরুতর বিপদ উপস্থিত। তিনি এই আশঙ্কা প্রকাশ করিলেন, যাহার জন্য এই যুদ্ধ উপস্থিত তাহারই কোনও অনিষ্ট ঘটিতে পারে। শুনিয়া শিষ্যদের মুখ মলিন হইয়া গেল। সকলে 'বোম কেদার' বলিতে বলিতে প্রস্থান করিলেন।

আবার চারিদিকে সেই থমথমে ভাব। দুই একটা পেচক কেবল মাঝে মাঝে ডাকিয়া উঠিয়া রজনীর নিস্তব্ধতা ভঙ্গ করিতেছে। এমনি কিছুক্ষণ গেল। হঠাৎ মন্ত্রী ও বলেন্দ্র বাহির হইলেন। মন্ত্রী কহিলেন,—রাজকুমার,

পিতৃসত্য পালন হেতু রঘুপতি রাজঐশ্বর্য পরিত্যাগ করিয়া বনবাসে গিয়াছিলেন। জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা পিতৃতুল্য, তাঁহার আজ্ঞা অবহেলা করা উচিত নয়।

তিনি মহারাজের পা ছুঁইয়া প্রতিজ্ঞা করিয়াছেন, সুতরাং মন মানুক আর নাই মানুক এই নিষ্ঠুর কাজ তাঁহাকে করিতেই হইবে। কর্তব্য তিনি স্থির করিয়া ফেলিয়াছেন। কিন্তু স্থির করিলে কি হয়? মনে এক অশান্তির আগুন জ্বলিয়া উঠিয়াছে। অবিরত তাহার তীব্র জ্বালায় ছটফট করিতেছেন। হায়, তিনি স্বপ্নেও ভাবেন নাই যে প্রাণপ্রিয়া ভ্রাতুষ্পুত্রী কৃষ্ণাকে পশুর মত নিজহস্তে হত্যা করিতে হইবে। নিশ্চয় তাঁহার পূর্বজন্মকৃত পাপ ছিল, নহিলে এমনভাবে জীবন বিড়ম্বিত হইবে কেন?

রঘুবরসিংহ ঘোড়া লইয়া আসিল। বলেন্দ্র মন্ত্রীর নিকট বিদায় লইয়া ঘোড়ায় চড়িলেন। সেই গভীর অন্ধকারের বুক চিরিয়া তীরবেগে বলেন্দ্র অদৃশ্য হইয়া গেলেন।

স্বস্তির নিশ্বাস ফেলিয়া মন্ত্রী মন্দিরে ফিরিলেন। যদিও চারিদিকে বিপদ, কুমারী কৃষ্ণার মৃত্যু যদিও তাঁহার অভিপ্রেত নয়, তথাপি বলেন্দ্রকে দিয়া কাজটা হইবে জানিয়া আজ তিনি নিশ্চিন্ত। মনে প্রবল আশা ছিল এই একটি প্রাণ বলি দিয়া লক্ষ প্রাণ রক্ষা হইবে।

মন্দিরে ফিরিয়া আসিয়া মন্ত্রী দেখিলেন মহারাজ মুমূর্ষুর মত পড়িয়া আছেন, শোকে তিনি মুহ্যমান। মন্ত্রীকে দেখিয়া

তিনি সহসা কহিলেন,—সত্যদাস, বলেন্দ্র কি চলিয়া গেল? হায় আমি মার মুখ কি আর দেখিতে পাইব না? ছি ছি আমি কি পাষণ্ড! মন্ত্রী চুপ করিয়া রহিলেন। কিছুক্ষণ পরে ধীরে ধীরে বলিলেন,—মহারাজ এসমস্তই বিধাতার ইচ্ছা।

বাহিরে প্রবল ঝড় বহিতেছে, মুহুর্মুহু মেঘগর্জন শুনা যাইতেছে। আকাশের দিকে চাহিয়া রাজা ভাবিলেন, রাত্রি বুঝি পামরের পাপ কর্ম দেখিয়া প্রচণ্ড কোপে এমন রুদ্রমূর্তি ধরিয়াছে। হয়তো প্রলয়কাল উপস্থিত হইয়াছে। যদি তাই হয়, তবে যেন তাঁহার মাথায় বজ্রাঘাত হয়। আকাশের দিকে চাহিয়া তিনি বলিলেন,—হে কাল, আমাকে গ্রাস কর; হে বজ্র, এই পাপাত্মাকে বিনষ্ট কর। সহসা বিকট শব্দে রাজা অট্টহাস্য করিয়া উঠিলেন, হাঃ হাঃ হাঃ হাঃ।

মন্ত্রী হতবুদ্ধি হইয়া গেলেন। এ কি? রাজা কি তবে পাগল হইলেন? মন্ত্রীর অনুমানই সত্য। রাজা সত্যই উন্মত্ত হইয়া গেলেন। তিনি বারবার কৃষ্ণা ও বলেন্দ্রের নাম করিতে করিতে কখনও কাঁদিতে কখনও বা হাসিতে লাগিলেন। এমনি করিতে করিতে হঠাৎ সংজ্ঞাহীন হইয়া ভূতলে পড়িয়া গেলেন।

বাহিরে ভৃত্য রক্ষক যাহারা ছিল মন্ত্রীমহাশয়ের ডাকে ছুটিয়া আসিল। রাজার দেহটি ধরাধরি করিয়া সকলে রাজগৃহের দিকে লইয়া গেল।

৬

এদিকে রাজ-অন্তঃপুরে এক বিষম বিপদ উপস্থিত। রানী এক দুঃস্বপ্ন দেখিয়া অস্থির হইয়া উঠিয়াছেন। অহল্যা স্বপ্নে দেখিয়াছেন যেন তিনি দুয়ারের কাছে দাঁড়াইয়া আছেন, আর সেই সময় একজন ভীষণাকৃতি বীরপুরুষ একখানা অসি হস্তে মন্দিরে প্রবেশ করিতেছে। কৃষ্ণা যেন মন্দিরের মধ্যে পালঙ্কে শয়ন করিয়া আছে। অহল্যা দেখিলেন ঐ বীরপুরুষ পালঙ্কের পাশে গিয়া কৃষ্ণাকে খড়্গাঘাত করিবার জন্য উদ্যত হইল। অমনি তিনি চীৎকার করিয়া উঠিলেন। সঙ্গে সঙ্গে ঘুম ভাঙিয়া গেল। অহল্যাদেবী তাহার পর হইতে কিছুতেই শান্ত হইতে পারিতেছেন না!

কৃষ্ণা তখনও শয়নমন্দিরে আসে নাই। সে সংগীত-শালায় গান করিতেছিল। তাহার সুমিষ্ট কণ্ঠস্বর তখনও ভাসিয়া আসিতেছিল। তাহা শুনিয়া তপস্বিনী রানীকে বুঝাইয়া বলিলেন যে রানীর আশঙ্কা অমূলক। এই তো কৃষ্ণা সংগীতশালায় বসিয়া প্রফুল্লমনে গান গাহিতেছে। রানী দুঃস্বপ্ন দেখিয়া অনর্থক এত বিচলিত হইয়াছেন। তপস্বিনীর কথায় রানী শান্ত হইয়া অন্তঃপুরে ফিরিলেন। কিন্তু অন্তরের আশঙ্কা সম্পূর্ণ দূরীভূত হইল কিনা কে বলিবে?

কিছুক্ষণ পরেই খড়্গহস্তে বলেন্দ্রসিংহ চুপি চুপি কৃষ্ণার শয়নকক্ষের দিকে আসিলেন। তিনি শতবার এই কক্ষে

আসিয়াছেন কিন্তু আজ এখানে প্রবেশ করিতে পা যেন আর উঠিতে চায় না। চোরের মত আজ তিনি প্রবেশ করিতেছেন। বীরপুরুষ হইয়া এমন হীন কাজও তাঁহাকে করিতে হইতেছে! সকলই কর্মফল! একবার তাঁহার ইচ্ছা হইল, কৃষ্ণাকে না মারিয়া নিজের বুকেই তরবারি বসাইয়া দেন। কিন্তু তাহাতেই বা লাভ কি? তাঁহার মৃত্যুতে কি বিপদ কাটিবে? না, শত্রুদল নিরস্ত হইবে? দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া বলেন্দ্র কিছুক্ষণ কি যেন ভাবিলেন, তাহার পর মনের দুর্বলতা যেন জোর করিয়া ঠেলিয়া দিয়া ঘরের মধ্যে ঢুকিলেন। কিন্তু কৃষ্ণা তখনও শয়ন করিতে আসে নাই। বলেন্দ্র নির্জন কক্ষে একলা দাঁড়াইয়া কি করিবেন ভাবিতে লাগিলেন। এমন সময়ে সংগীতশালা হইতে কৃষ্ণার সুমিষ্ট কণ্ঠস্বর ভাসিয়া আসিল—কে যেন তাঁহার বুকের মধ্যে হৃৎপিণ্ডটা ধরিয়া টানিয়া ছিঁড়িয়া ফেলিতে লাগিল। দুই হাতে বক্ষ চাপিয়া তিনি কোন-রকমে আত্মসংবরণ করিলেন।

রাত্রি বাড়িল। সংগীতশালা নীরব হইল। বলেন্দ্র সংজ্ঞাহীনের মত কৃষ্ণার শয়নকক্ষে দাঁড়াইয়া আছেন। কতক্ষণ এইভাবে আছেন সে খেয়ালও নাই। হঠাৎ কৃষ্ণার পদশব্দে তাঁহার চৈতন্য ফিরিল। তিনি একটু অন্তরালে সরিয়া দাঁড়াইলেন। কৃষ্ণার প্রায় পিছনে পিছনে তপস্বিনীও প্রবেশ করিলেন। এত রাত্রি পর্যন্ত সংগীতশালায় থাকা উচিত হয় নাই বলিয়া তপস্বিনী কৃষ্ণাকে মৃদু তিরস্কার করিয়া শীঘ্র

শয়ন করিতে আদেশ দিলেন। কিন্তু কৃষ্ণার শয়ন করিতে ইচ্ছা হইল না। সে মাতাকে অত্যন্ত ব্যাকুল দেখিয়া আসিয়াছিল, তাহার মন কেমন করিতে লাগিল। তপস্বিনীকে মাতার এই ব্যাকুলতার কারণ জিজ্ঞাসা করিলে তিনি বলিলেন, কৃষ্ণা জননীর একমাত্র কন্যা। তাহার বিবাহ লইয়া এক মহা গোলযোগ উপস্থিত হইয়াছে। তাই স্বভাবতঃই মায়ের প্রাণ চঞ্চল হইয়া উঠিয়াছে। ইহা ছাড়া আর কিছু নয়। কৃষ্ণাকে এজন্য চিন্তা করিতে নিষেধ করিয়া তপস্বিনী বিদায় লইলেন।

কৃষ্ণার কিন্তু আজ নিদ্রা নাই। নানা চিন্তা তাহার মনে ভিড় করিতেছে। মহারাজ মানসিংহ যে জয়পুররাজকে সৈন্যসামন্ত লইয়া আক্রমণ করিবার উদ্‌যোগ করিতেছেন তাহা সে শুনিয়াছিল। তাই ভাবিতে লাগিল, এ যুদ্ধের পরিণতি কি হইবে? মানসিংহ জয়পুররাজ জগৎসিংহকে পরাজিত করিতে পারিবেন তো? যদি না পারেন, যদি নিজে পরাজিত হন? কৃষ্ণা সে কথা ভাবিতেও পারে না।

কৃষ্ণা শয্যায় না গিয়া জানালার কাছে আসিয়া দাঁড়াইল। জানালা খুলিয়া দিতেই বাহিরের জমাট অন্ধকার চোখে পড়িল। ঝড়ও আরম্ভ হইয়াছে। মাঝে মাঝে বিদ্যুৎ চমকিয়া অন্ধকারকে আরও ভয়াল করিয়া তুলিতেছে। মেঘের গর্জনে সমস্ত বিশ্বসংসার যেন কাঁপিয়া উঠিতেছে। রাত্রির এই প্রলয়ংকরী মূর্তি দেখিয়া কৃষ্ণার অন্তর শিহরিয়া উঠিল। সে ভাবিতে লাগিল এই ভীষণ ঝড়ে তাহাদের তো কোনও

ক্ষতি হইবে না। এই বিশাল পর্বতপ্রমাণ প্রাসাদ যেমন আছে—তেমনি থাকিবে; কিন্তু ঐ যে দূরে দরিদ্রের কুটীরগুলি বিদ্যুতের আলোকে দেখা যাইতেছে, ঝড়ে উহাদের কি দুরবস্থাই না হইবে! হতভাগ্য দীনদরিদ্রদের কথা ভাবিয়া কৃষ্ণার চোখে জল আসিল।

এক কথা হইতে অন্য কথা মনে আসে। ভাবে, ধনরত্ন দিয়াই কি মানুষ সুখী হয়? তাহা তো হয় না। এই তো তাহার কোনও অভাবই নাই, সে তো মহা ঐশ্বর্যের মধ্যে বাস করিতেছে; কিন্তু তাহার মনে তো দুঃখের অবধি নাই। সে রাজকন্যা হইয়াও এত ক্লেশ, এত মনঃকষ্ট পাইতেছে কেন? পর্ণকুটীরবাসী যে দীনদরিদ্রগণের দুঃখে সে মুহূর্তকাল পূর্বেই দুঃখ বোধ করিতেছিল, এখন মনে হইল তাহারা অনেক বেশী সুখী।

কিন্তু রাত্রি অনেক হইতেছে। এতক্ষণ সে ভাবনার সাগরে ডুবিয়া ছিল, কিছুই টের পায় নাই। হঠাৎ জ্ঞান হইতেই তাড়াতাড়ি শয্যায় আসিয়া শয়ন করিল।

অন্তরালে লুকাইয়া বলেন্দ্রসিংহ কাঁপিতেছিলেন। তাঁহার শিরায় শিরায় অতি দ্রুতবেগে রক্তস্রোত বহিতেছিল। স্নেহের পুত্তলিকে তিনি পশুর মত নিজহস্তে বধ করিতে আসিয়াছেন। নিজের প্রতি ঘৃণায় তাঁহার অন্তর ভরিয়া গিয়াছে। কিন্তু হায়, তিনি কি করিবেন? জ্যেষ্ঠভ্রাতার আদেশ! তিনি তো সম্পূর্ণ নির্দোষ, স্বেচ্ছায় তিনি এ

মহাপাপ করিতে আসেন নাই। কিন্তু তথাপি মন মানে না। নিজের প্রতি ধিক্‌কারে অন্তর ভরিয়া উঠে! কৃষ্ণা ঘুমাইতেছে—তাহার নিদ্রিত সুকোমল মুখটির দিকে চাহিয়া চাহিয়া বলেন্দ্রের চোখ জলে ভাসিয়া গেল। কিছুতেই তিনি মনকে প্রস্তুত করিতে পারিলেন না।

কিন্তু আর সময় নষ্ট করা উচিত নয়। মনকে সংযত করিয়া ধীরে ধীরে বলেন্দ্রসিংহ উন্মুক্ত অসি হস্তে কৃষ্ণার শয্যার দিকে আগাইয়া আসিলেন। মনে মনে কহিলেন,—হে পৃথিবী, হে রজনীদেবী, তোমরা সাক্ষী। আমি নিজের ইচ্ছায় এ পাপ করিতেছি না। এই বলিয়া তিনি শানিত নগ্ন তরবারি উর্ধ্বে উঠাইলেন।

এমন সময় সহসা কৃষ্ণা উঠিয়া বসিল, সম্মুখে কাকাকে দেখিয়া বিস্মিত হইয়া কহিল,—অ্যাঁ, কাকা, এ কি? আপনি? এ সময়ে? এখানে?

বলেন্দ্রের মুখে কোনও কথা ফুটিল না। তিনি হাতের তরবারি ভূতলে নিক্ষেপ করিয়া মুখ ঢাকিয়া রোদন করিতে লাগিলেন। শেষে অতিকষ্টে আত্মসংবরণপূর্বক উত্তর করিলেন,—না মা, এমন কিছু নয়। কেবল তোমাকে একবার দেখিতে আসিয়াছি।

কৃষ্ণা বুঝিল, বলেন্দ্র প্রকৃত ব্যাপারটা চাপিয়া যাইতেছেন। তাহার কেমন ভয় ভয় করিতে লাগিল। ব্যাকুল হইয়া কহিল,—কাকা! এ কথা সত্য নয়। দাসীর সঙ্গে প্রবঞ্চনা

করিবেন না। সত্য করিয়া বলুন, কি হইয়াছে। কেন এত রাত্রে আমার শয়নকক্ষে আসিয়াছেন?

বলেন্দ্র নিরুত্তর, তাঁহার মুখ দিয়া একটি কথাও বাহির হইল না।

ভূতলে পতিত অস্ত্রটা কৃষ্ণার চোখে পড়িয়া গেল। সে আরও বিস্মিত হইল। ভাবিল, এ কি? অস্ত্র কেন? সহসা তাহার মনে কি বুদ্ধি জাগিল, তাড়াতাড়ি সেই অস্ত্রটা তুলিয়া লইয়া বক্ষের অঞ্চলের তলে লুকাইয়া ফেলিল। বলেন্দ্র তাহা দেখিতে পাইলেন না। কৃষ্ণা ব্যাকুল কণ্ঠে কহিল,—কাকা, আপনার দুটি পায়ে পড়ি, আপনি আমাকে সকল কথা খুলিয়া বলুন।

বলেন্দ্র আর থাকিতে পারিলেন না। তিনি প্রায় চীৎকার করিয়া বলিয়া উঠিলেন,—না না আমাকে আর তুমি কাকা বলিয়া ডাকিও না, আমি নরাধম নিষ্ঠুর, আমি চণ্ডাল। আমি তোমার কাল হইয়া আসিয়াছিলাম। আর কিছু বলিতে পারিলেন না। হঠাৎ তিনি শিশুর মত কাঁদিতে লাগিলেন।

কথা শুনিয়া কৃষ্ণা অবাক হইয়া গেল। প্রথমটা সে কিছুই বুঝিতে পারিল না। কাকা তাহাকে হত্যা করিতে আসিয়াছেন! কেন? সে কি অপরাধ করিয়াছে? তাহাকে হত্যা! কথাটা কেমন অদ্ভুত শুনাইল। সে বলিল,—কেন কাকা? আমি কি দোষ করিয়াছি?

বলেন্দ্র কহিলেন,—হায় মা, তুমি আর কি দোষ করিবে? তুমি কি কোনও দোষ করিতে পার? তুমি দেবকন্যার ন্যায় নির্দোষ, নিষ্পাপ। মরুদেশের রাজা মানসিংহ আর জয়পুরের রাজা জগৎসিংহ উভয়েই এই প্রতিজ্ঞা করিয়াছেন যে, হয় তোমাকে বিবাহ করিবেন নতুবা উদয়পুরকে ভস্মরাশিতে পরিণত করিয়া এ রাজ্য লণ্ডভণ্ড করিয়া দিবেন। আমাদের অবস্থা তো সবই জান। সেইজন্যই—বলেন্দ্র আর বলিতে পারিলেন না। তাঁহার গলাটা কে যেন চাপিয়া ধরিল। মাথা নীচু করিয়া তিনি কাঁদিতে লাগিলেন।

কৃষ্ণা কহিল,—পিতারও কি এই ইচ্ছা?

বলেন্দ্র বলিলেন,—মহারাজের অনুমতি ছাড়া তিনি এই পাপকর্মে কখনও কি প্রবৃত্ত হইতে পারেন?

সকল শুনিয়া কৃষ্ণা কিছুক্ষণ কি ভাবিল। পরে বলেন্দ্রকে সান্ত্বনা দিয়া বলিতে লাগিল, ইহার জন্য দুঃখ বা ক্ষোভ করিবার কিছু নাই। তিনি মহারাজকে ডাকিয়া আনিলে কৃষ্ণা স্বয়ং স্বেচ্ছায় তাঁহার চরণে জন্মের মত বিদায় লইবে। কৃষ্ণা তো আর সামান্য মেয়ে নয়। রাজবংশে তাহার জন্ম, মহারাজ ভীমসিংহের কন্যা সে, বীরকেশরী বলেন্দ্রসিংহের ভ্রাতুষ্পুত্রী। সে কি মৃত্যুকে ভয় করে? মৃত্যুকে সে হাসিমুখে বরণ করিয়া লইবে।

কৃষ্ণা কাকাকে সান্ত্বনা দিতে দিতে হঠাৎ চকিত হইয়া উঠিল। আবার সেই অলৌকিক ব্যাপার ঘটিল। সহসা

আকাশে এক মধুর বাদ্য শুনিতে পাইল। সহসা দুয়ারের কাছে এক অপরূপ রূপলাবণ্যবতী নারীকে সে যেন দেখিতে পাইল। উনি আর কেহই নন—সেই সতী পদ্মিনী, যিনি বংশের সম্মান রক্ষার জন্য অগ্নিকুণ্ডে আত্মাহুতি দিয়া চির স্বর্গবাস লাভ করিয়াছেন। নন্দন কাননের স্বর্গীয় সৌরভে কক্ষটি পরিপূর্ণ হইয়া গেল। কৃষ্ণা স্তম্ভিত বিহ্বল হইয়া সতী পদ্মিনীর দিকে চাহিয়া রহিল। তাহার মুখ দিয়া শুধু একটি কথা বাহির হইল,—আহা আমার কি সৌভাগ্য!

এমন সময় বাহিরে কাহার পদশব্দ শোনা গেল। কিছুক্ষণ পরেই রাজা ও মন্ত্রী প্রবেশ করিলেন। রাজা পাগলের মত চারিদিকে চাহিতে লাগিলেন। মন্ত্রী সত্যদাস বলেন্দ্রকে বলিলেন,—রাজার জ্ঞান নাই। একেবারে উন্মাদ অবস্থা! শুনিয়া বলেন্দ্রের মাথায় যেন বজ্রাঘাত হইল।

মন্ত্রী দেখিলেন, কৃষ্ণাকে এখনও নিহত করা হয় নাই। ভাবিলেন রাজার তো এই অবস্থা। আর এ পাপকর্ম করিয়া লাভ কি? তিনি বলেন্দ্রকে মনের কথা জানাইলেন। বলেন্দ্রও সেই কথা ভাবিতেছিলেন।

রাজা কখনও হাসিতেছেন, কখনও কাঁদিতেছেন, কখনও বা প্রলাপ বকিতেছেন। পিতার অবস্থা দেখিয়া কৃষ্ণার বুক ফাটিয়া যাইতে লাগিল। সে মনে মনে প্রতিজ্ঞা করিল, নিজের প্রাণ দিয়া যদি রাজ্য রক্ষা করা যায়, পিতার দুঃখ ও চিন্তার অবসান ঘটান যায়, তবে সে

তাহাই করিবে। আবার আকাশ হইতে সেই মধুর ধ্বনি তাহার কানে পৌঁছিল। কৃষ্ণা কহিল,—ঐ যে সতী পদ্মিনী আমাকে ডাকিতেছেন। ঐ যে বলিতেছেন,—কুলমান রক্ষার জন্য যে রমণী আপন প্রাণ দান করে, স্বর্গলোকে তাহার আদরের সীমা থাকে না। পিতা আমাকে বিদায় দিন। আমি যাই।

বলেন্দ্র কৃষ্ণার কথা শুনিয়া যে কতখানি মর্মাহত হইলেন, তাহা বলিয়া শেষ করা যায় না। তিনি শুধু বলিলেন,—ছিঃ মা ও কথা বলিতে নাই। যাহা হইবার হইয়াছে। সে কথা ভুলিয়া যাও।

কৃষ্ণা কিন্তু আর কাহারও কথা কানে তুলিল না। স্বয়ং সতী পদ্মিনী তাহাকে ডাক দিয়াছেন। সে কি সে ডাক উপেক্ষা করিতে পারে? কৃষ্ণা ঠিক করিল, আপনার প্রাণ দিয়াও পিতৃরাজ্য রক্ষা করিবে। রাজ্যের মঙ্গল সাধন করিবে। শতসহস্র নিরপরাধ নরনারীর প্রাণ রক্ষা করিবে। সে ভাবিল এমন সৌভাগ্য সে হেলায় হারাইবে না। নিজের প্রাণ হারাইবে কিন্তু তাহার পরিবর্তে পিতৃবংশের ও পিতৃরাজ্যের কত বড় কল্যাণ সাধিত হইবে! আর পরকালে সে যে অক্ষয় স্বর্গ লাভ করিবে, কয়জনের ভাগ্যে তাহা জুটে? আর পৃথিবীতেও তাহার নাম চিরস্মরণীয় হইবে। কৃষ্ণার মনে আর কোনও চিন্তা নাই, কোনও দ্বিধা নাই। সে তাহার কর্তব্য স্থির করিয়া ফেলিয়াছে।

আবার আকাশে সেই কোমল মধুর বাদ্য বাজিয়া

উঠিল। কৃষ্ণা আর থাকিতে পারিল না। সহসা অঞ্চলের ভিতর হইতে অস্ত্র বাহির করিয়া নিজ বক্ষে আমুল বিদ্ধ করিয়া দিল। রক্তাক্ত দেহ মাটিতে লুটাইয়া পড়িল।

সকলে চীৎকার করিয়া উঠিলেন। এ সর্বনাশ কেহ আশঙ্কাও করে নাই। বলেন্দ্র শিশুর মত চীৎকার করিয়া কাঁদিতে লাগিলেন। ক্রন্দনধ্বনি শুনিয়া তপস্বিনী আসিলেন। আসিয়াই সম্মুখে যাহা দেখিলেন, তাহাতে তাঁহার অন্তরাত্মা শুকাইয়া গেল, দুই চক্ষু ভরিয়া জল উথলিয়া উঠিল। কিন্তু মহারাজ ভীমসিংহ কিছুই দেখিলেন না, কিছুই বুঝিলেন না। তিনি নির্বিকার।

চীৎকার শুনিতে পাইয়া অহল্যাদেবীর নিদ্রা ভঙ্গ হইল। তিনি ছুটিয়া কৃষ্ণার কক্ষে উপস্থিত হইলেন। ব্যাপার দেখিয়া প্রথমটা তিনি যেন নিজের চোখকে বিশ্বাস করিতে পারিলেন না। চারিদিকে তখন রক্তের বন্যা বহিতেছে। অহল্যাদেবী কৃষ্ণার কাছে আসিয়া কাতরকণ্ঠে কহিলেন,—মা গো, আমার উপর তুমি রাগ করিয়াছ? আমি তোমার অভাগিনী মা তোমাকে ডাকিতেছি। একটিবার সাড়া দাও মা। অশ্রুর বন্যা তাঁহার বক্ষোদেশ ভাসাইয়া দিল।

কৃষ্ণার তখন শেষ অবস্থা। মৃদুস্বরে সে কহিল,—মা! আসিয়াছ? আমাকে পায়ের ধুলা দাও। তোমরা আমার সকল দোষ ক্ষমা করিও, আমি চলিলাম। তোমার এ দুঃখিনী মেয়েকে মাঝে মাঝে মনে করিও।

কৃষ্ণার দেহ ক্রমশঃ অসাড় হইয়া আসিল। চোখের জ্যোতি মিলাইয়া গেল। রাজকন্যা এই পাপ পৃথিবী হইতে চিরদিনের জন্য বিদায় লইল।

অহল্যাদেবী দুঃসহ শোকে মূর্ছিত হইয়া পড়িলেন। রাজার বাহ্যজ্ঞান নাই। তিনি প্রলাপ বকিতেছেন। কখনও বলিতেছেন,—আমার কৃষ্ণা কই? কখনও বলিতেছেন,—কৃষ্ণাকে কেহ দেখিয়াছ? চেতনা পাইয়া অহল্যাদেবী উঠিয়া বসিলেন। রাজার হাতে রক্ত দেখিয়া তাঁহার দৃঢ় ধারণা হইল যে রাজাই কৃষ্ণাকে হত্যা করিয়াছেন। রাগে, অভিমানে, ঘৃণায় তিনি পাগলের মত ঘর হইতে বেগে বাহির হইয়া গেলেন।

মন্ত্রী ব্যস্ত হইয়া পড়িলেন, তপস্বিনী রানীর পশ্চাতে ছুটিলেন। কিন্তু কিছুক্ষণ পরেই ফিরিয়া আসিয়া জানাইলেন রানীও প্রাণত্যাগ করিয়াছেন। বলেন্দ্র কহিলেন,—মন্ত্রী, আর কি? সবই শেষ হইল, মৃত্যু শুধু আমাকেই ভুলিয়া গিয়াছে। আর এ রাজ্যে কাজ কি? কাঁদিতে কাঁদিতে বলেন্দ্র মাটিতে লুটাইতে লাগিলেন। মহারাজ ভীমসিংহের সৌভাগ্য, তিনি কিছুই জানিলেন না, মহা দুঃখশোকের হাত হইতে তিনি বাঁচিয়া গিয়াছেন। সত্যদাস নির্বাক প্রস্তরমূর্তির মত নিস্পন্দ হইয়া রহিলেন।

অধ্যাপক শ্রীবিজনবিহারী ভট্টাচার্য প্রণীত

১. প্রভাত-রবি

মূল্য তিন টাকা

—রবীন্দ্রনাথের জীবনের প্রথম বিশ বৎসরের বিবরণ। পুস্তকের আরম্ভে লেখক তাঁর সংকল্প জানিয়েছেন—'কবি এই কালকে "প্রাগৈতিহাসিক" বলিয়া পরিহাস করিয়াছেন। সাহিত্যের দরবারে স্থান পাইবার অযোগ্য বলিয়া তিনি ওই কালের সমস্ত রচনাকে বর্জন করিয়াছিলেন। সেই কারণে সে কালের কাব্যকে ভুলিয়াছি, সঙ্গে সঙ্গে কবিকেও ভুলিয়াছি। কিন্তু রবীন্দ্রনাথের বহুমুখী প্রতিভার উদ্‌বোধন ও উৎসারণের ইতিহাস অঙ্কে ধারণ করিয়া যে গুপ্তযুগ আমাদের স্মৃতির অন্তরালে আত্মগোপন করিয়াছে, কবি নিজে যতই অবজ্ঞা করুন আমাদের কাছে তার মূল্য অপরিমেয়। সে যুগকে আমরা ব্যক্ত দেখিতে চাই। বর্তমান গ্রন্থে তাহার জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করা হইয়াছে।' গ্রন্থকারের চেষ্টা পূর্ণমাত্রায় সফল হয়েছে বললে অত্যুক্তি হবে না। তাঁর সংগ্রহ আর লিখনভঙ্গীর গুণে সেই প্রাচীন পরিবেশ এবং তার কেন্দ্রবর্তী বালক, কিশোর নবযুবক রবীন্দ্রনাথের স্বরূপ আমাদের চোখের সামনে জীবন্তের মতন ফুটে উঠেছে।

—রাজশেখর বসু

সংক্ষিপ্ত প্রভাত-রবি

মূল্য দেড় টাকা

৩. গান্ধীজির জীবনপ্রভাত

মূল্য পাঁচ সিকা

শ্রীমান্ বিজনবিহারী 'গা ন্ধী জি র জী ব ন প্র ভা ত' গ্রন্থে এক মহামানবের আদর্শ প্রতিষ্ঠার চেষ্টা করিয়াছেন এবং উহা দেশের ছেলেমেয়েদের হাতে তুলিয়া দিয়া আমাদের সকলের ধন্যবাদভাজন হইয়াছেন। .... যিশুখ্রীস্টকে ভক্ত খ্রীস্টানগণ ভগবানের পুত্র বলিয়া শ্রদ্ধাঞ্জলি প্রদান করেন। কিন্তু এক হিসাবে ভগবানের সন্তান নহে কে? গৌতম বুদ্ধও মানুষের মনোমন্দিরে ভগবানের অবতাররূপে পূজিত হইতেছেন। বহু শতাব্দীর পর মহাত্মাজিও হয়তো মানব-সভ্যতা ও সৃষ্টির ইতিহাসে বিশ্বমানবতার আদর্শরূপে পরিগণিত হইবেন। মহাত্মাজি কি কেবল রাজনীতিজ্ঞ? তাঁহাকে আমি একাধারে ধার্মিক, সত্যপ্রিয়, শিক্ষাব্রতী ও পরদুঃখকাতর বলিয়া জানি।

আমি আশা করি, ভারতের ভবিষ্যৎ জীবনপ্রভাতে 'গা ন্ধী জি র জী ব ন প্র ভা ত' চিরভাস্বর থাকিবে।

শ্রীপ্রমথনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়
ভাইসচ্যান্সেলার, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়